স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

ভারত-প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. জগতের কাছে ভারতের বাণী 2
২. ভূমিকা 8
৩. আর্য ও তামিল 13
৪. ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ 21
৫. সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ 35
৬. ভারতের মানুষ 42
৭. ভারতের রীতিনীতি 45
৮. ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ? 50
৯. হিন্দু ও খ্রীষ্টান 56
১০. ভারতে খ্রীষ্টধর্ম 61
১১. ভারতে শিক্ষাচর্চা 67
১২. ভারতের নারী 69
১৩. বক্তৃতা 71

১. জগতের কাছে ভারতের বাণী

['India's Message to the World' নামে একটি বই লেখার উদ্দেশ্যে স্বামীজী ৪২টি চিন্তাসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বইটির ভূমিকাসহ সামান্য কয়েকটি চিন্তাসূত্রই বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছিল। দেহাবসানের পর এই অসমাপ্ত ইংরেজী রচনাটি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে খসড়া-রচনাটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

সূচী

১. পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বীরত্বপূর্ণ। দেশবাসীর উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।

২. ঐশ্বর্যময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অন্ধকার দিক্‌গুলি গাঢ়তর এবং আলোকিত দিক্‌গুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

৩. পর্যবেক্ষণের ফলঃ ভারতবাসীর অধঃপতন হইয়াছে—এ-কথা সত্য নহে।

৪. প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশালরূপে দেখা দেয় নাই।

৫. ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

৬. অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ক্ষণস্থায়ী বিপুলপ্রাণশক্তিসম্পন্ন জাতীয়-জীবন দেখা দিয়াছে, তারপর উহার ধ্বংস হইয়াছে।

৭. অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যা যত বিরাট, উহা সমাধানের চেষ্টাও তত শান্ত উপায়ে দেখা দিয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভিন্ন আচার-পদ্ধতি, বিশেষভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মসম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৮. যে-দেশে সমস্যা অত বিরাট ছিল না, বলপ্রয়োগ দ্বারাই ঐক্যস্থাপিত হইয়াছিল, সে-দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র উন্নতির পন্থাগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া প্রধান গোষ্ঠীটিই উন্নত হইয়াছে। একটি বিশেষ শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যবহার করিয়াছে; ফলে উন্নতির বেশীর ভাগ সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে—যখন সেই প্রাধান্য প্রয়াসী গোষ্ঠীটির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তখন গ্রীস রোম বা নর্মানদের ন্যায় আপাত-অভেদ্য জাতিসৌধগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৯. একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে এ-কথাও বলা যায়, ইহা দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।

১০. এমন একটি মহান্ পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃত সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।

১১. দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বাস্তব ক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১২. একটি জাতীয় পটভূমি পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

১৩. মধ্য-এশিয়া হইতে বাল্টিক উপসাগর অবধি এলাকায় কোন পৃথক্ ও বিশিষ্ট আর্যজাতি ছিল কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

১৪. তথাকথিত জাতি-রূপ (type)। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

১৫. সোনালী চুল ও কালো চুল।

১৬. তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা হইতে সহজবুদ্ধির বাস্তব জগতে অবতরণ। প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে।

১৭. ইহার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা দেয়।

১৮. 'সংস্কৃত' যেমন ভাষা-সমস্যার সমাধান, 'আর্য' তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান 'ব্রাহ্মণত্ব' ।

১৯. ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ—'ব্রাহ্মণত্ব' ।

২০. স্বার্থহীন, সম্পদ্‌হীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের ঊর্ধ্বে।

২১. জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে।

২২. যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোন দাবী করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবী করে।

২৩. ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আদর্শের অবনতি। পুরাণে আছে, কলিযুগে কেবল অব্রাহ্মণেরাই থাকিবে। সে-কথা সত্য, দিনে দিনে আরও সত্য হইয়া উঠিতেছে। কিছু পরিমাণ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—একমাত্র ভারতবর্ষেই আছেন।

২৪. ব্রাহ্মণত্ব লাভের পূর্বে আমাদিগকে ক্ষাত্র-আদর্শের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কেহ হয়তো পূর্বে এই আদর্শে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে উহার পরিচয় দিতে হইবে।

২৫. কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠা প্রয়োজন।

২৬. একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীরা একটি বংশগত নামে এক ধরনের দেবতার উপাসনা করে—যেমন ব্যাবিলোনীয়দের 'বাল'-দেবতা উপাসনা এবং হিব্রুদের 'মোলোক' -দেবতা উপাসনা।

২৭. ব্যাবিলোনীয়দের সব 'বাল'-দেবতাকে 'বাল-মেরোডাক'-এ পরিণত করা এবং য়াহুদীদের সব 'মোলোক'কে 'মোলক যিয়াবাহ্' বা 'ইয়াহু'তে পরিণত করার চেষ্টা।

২৮. ব্যাবিলোনীয়েরা পারসীকদের দ্বারা ধ্বংস হয়। হিব্রুগণ ব্যাবিলোনীয়দের পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনমত গড়িয়া লয় এবং একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম গড়িতে সমর্থ হয়।

২৯. স্বৈর রাজতন্ত্রের মত একেশ্বরবাদে শক্তি কেন্দ্রীভূত,আদেশ অনুযায়ী দ্রুত কার্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু আর কোন বিকাশ ইহা দ্বারা হয় না। একেশ্বরবাদের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি—নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে-সকল জাতি এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য সহসা উন্নতি লাভ করিয়া অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।

৩০. ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সমাধান মিলিল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বহুন্তি।' সর্বপ্রকার সাফল্যের পশ্চাতে ইহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ, সমগ্র সৌধের ইহাই কেন্দ্র-শিলা।

৩১. ফলস্বরূপ—বৈদান্তিকের সেই আশ্চর্য উদার সহনশীলতা।

৩২. সুতরাং বিরাট সমস্যা হইল বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট না করিয়া উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি-সাধন।

৩৩. স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত কোন প্রকার ধর্মের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব।

৩৪. এইখানেই অদ্বৈতবাদের মহিমা। অদ্বৈতবাদ কোন 'ব্যক্তি'র নয়—'আদর্শ'-এর প্রচারক; অথচ পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়।

৩৫. চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—এই অর্থে আমরা সর্বদা অগ্রসর হইতেছি।—মুসলমান আমলের মহাপুরুষবৃন্দ।

৩৬. প্রাচীনকালে এই আদর্শ পূর্ণসচেতন ও শক্তিশালী ছিল, আধুনিককালে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; এই অর্থে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

৩৭. ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবেঃ যদি কিছুকালের জন্য একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত শ্রমের দ্বারা আশ্চর্য ফল লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বহুকাল ধরিয়া যে-সকল জাতি রক্ত ও আদর্শের মধ্য দিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাদের সমবায়ে যে ভবিষ্যৎ মহাশক্তি গড়িয়া উঠিবে—তাহা আমি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি।
ভারতের ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে তরুণতম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত একটি জাতি, যাহা প্রাচীনতমও বটে।

৩৮. আমাদের কোন্ পন্থায় কাজ করিতে হইবে? স্মৃতি-অনুসারে নির্ধারিত কয়েকটি সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি। কিন্তু উহাদের একটিও শ্রুতি হইতে আসে নাই। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্তন হইবে—ইহাই নিয়মরূপে স্বীকৃত।

৩৯. বেদান্তের আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, বাহিরেও প্রচার করিতে হইবে। লেখার মধ্য দিয়া নয়, ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতির মানস-গঠনে আমাদের চিন্তাধারা সঞ্চার করিতে হইবে।

৪০. কলিকালে দানই একমাত্র কর্ম। কর্মের দ্বারা শুদ্ধ না হইলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

৪১. পরা ও অপরা—দুই ধরনের বিদ্যাই দান করিতে হইবে।

৪২. জাতির আহ্বান–ত্যাগ এবং ত্যাগীর দল।

২. ভূমিকা

প্রতীচ্যে জনগণের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। হে প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের প্রতি আমার বাণী বলিষ্ঠতর। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী আমার সাধ্যানুযায়ী আমি প্রতীচ্য জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদৃপ্ত কণ্ঠের মৃদু অথচ নিশ্চিত বাণী স্পন্দিত হইতেছে, দিনে দিনে সেই ধ্বনি স্পষ্টতর হইতেছে—উহা বর্তমান ভারতের নিকট ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

নানা জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, আচার-ব্যবহারের—সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই মনুষ্যহৃদয় একই ধরনের আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতা লইয়া স্পন্দিত হইতেছে।

ভালমন্দ সর্বত্রই আছে। উহাদের সামঞ্জস্যও আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে সর্বত্র সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা; তাহার নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে জানিলে সে কখনও কাহাকেও ভুল বুঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এমন নরনারী আছেন, যাঁহাদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁহারা সম্রাট্ অশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

যে পবিত্র ভালবাসার সহিত প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃস্বার্থ হৃদয়েই সম্ভব, সে-দেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

আমার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল—সে-সবই তো আমি এই দেশের কাছে পাইয়াছি, এবং যদি আমি কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া থাকি, সে গৌরব আমার নয়, তোমাদের। কিন্তু দুর্বলতা ও ব্যর্থতা—সেগুলি আমার ব্যক্তিগত; সে-সবই এই দেশবাসীকে যে মহতী ভাবধারা আজন্ম ধারণ করিয়া রাখে, তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার শক্তির অভাববশতঃ।

আর কী দেশ! বিদেশী অথবা স্বদেশী, যে-কেহ এই পবিত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে—যদি তাহার মন পশুস্তরে অধঃপতিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে-সন্তানেরা পশুসত্তাকে দিব্যসত্তায় উন্নীত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেদের পরিবৃত অনুভব করিবে। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত হইতেছে।

দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সব-কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

এইখানে এই মানবতা-সমুদ্রে সুখ-দুঃখ, সবলতা-দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোতসংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসমূহ—জীবন- তৃষ্ণা, এ জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয়, এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে

কখনও হইবে না; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র। এই একটি দেশ, যেখানে ধর্ম বাস্তব সত্য, এইখানেই নরনারী সাহসের সহিত অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নরনারী জীবনের সুখ-সম্ভোগের জন্য উন্মাদের মত ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানব-হৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সব-কিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।

আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখনও মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনও প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত—বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মত পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সত্যই মহিমময় ভবিষ্যৎ, কারণ প্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে আমরা পৃথিবীর সমক্ষে স্পর্ধাপূর্বক এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিঃ 'ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ' –সন্তান বা ধনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। জাতির পর জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাসনার জগতে থাকিয়া তাহারা জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে– নূতন জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি না যুদ্ধ, সহনশীলতা না অসহিষ্ণুতা, সততা না খলতা, বুদ্ধিবল না বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা না ঐহিকতা–শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি জয়ী হইবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকী।

বহুযুগ পূর্বে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ অবধি ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই। আমাদের সমাধান–ত্যাগ ও অপার্থিবতা।

সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর–ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সূর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ–কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসে কেহ এমন একটি যুগ দেখাইয়া দিন দেখি, যে-যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন, এমন মহাপুরুষের এখানে অভাব ছিল। কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক–সে-কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিজস্ব শান্ত প্রকৃতির দরুন এ প্রভাব বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রয়োজন হইয়াছে, যদিও স্বদেশের গণ্ডিতে ইহা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ইহার ফলে যখনই তাতার, পারসীক, গ্রীক বা আরব

জাতি এদেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ-সাধন করিয়াছে, তখনই এদেশ হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের মত সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই এক ধরনেরই ঘটনা আবার আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের জলপথ ও স্থলপথ এবং ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের অসাধারণ বিকাশের ফলে পুনরায় সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধিত হইয়াছে, এবং সেই একই ব্যাপারের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমার কথা লক্ষ্য করুন, এ কেবল সামান্য সূচনা মাত্র, বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহ আসিতেছে। বর্তমানে ভারতের বাহিরে যে-কাজ হইতেছে, তাহার ফলাফল কি, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু নিশ্চিত জানি, লক্ষ লক্ষ লোক—আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিতেছি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে-বাণী—আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই তাঁহাদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে। গ্রন্থের শেষ ভাগে আমাকে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমি অন্য একটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি—দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম।

এই সমস্যার দুইটি দিক্—কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে এই জাতি গঠিত, সেগুলির সমীকরণ। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক আত্মীয়তাসূত্রে বিধৃত করা প্রত্যেক জাতির সাধারণ কর্তব্য।

[রচনাটি অসমাপ্ত]

৩. আর্য ও তামিল

['প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ]

সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; য়াহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই-সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তন পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রকৃতির এই উন্মাদনার মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বলিত এবং তাহাদের পন্থা ছিল 'বর্ণাশ্রমাচার'—তথাকথিত জাতিভেদ-প্রথা।

আর্যজাতির জনসাধারণ অবশ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকগুলি সুবিধা নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল। তবু জাতিভেদ-প্রথা চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত নত হইয়া পড়িত।

ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত বুদ্ধি দ্বারাই এই আর্যজাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে চালিত করিয়াছিল। ভারতের প্রধান জাতি আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।

অন্যান্য দেশের সামাজিক পদ্ধতি হইতে আপাততঃ পৃথক্ মনে হইলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে আর্যদের জাতবিভাগপ্রথা দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমতঃ অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। রাইন নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশি হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি অতীতের কোন অরণ্যচারী সংসারবিরাগী, সর্বস্বত্যাগী, ভিক্ষান্নজীবী, ইহকাল ও পরকালের তত্ত্বালোচনায় জীবনযাপনকারী ঋষিকে পূর্বপুরুষ বলিতে পারিলে আনন্দিত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রাগত পার্থক্য। অন্য সব দেশে জাতিনির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন নর বা নারীই যথেষ্ট। ধন, ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে-কেহ নিজ জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে-কোন স্তরে আরোহণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে সমগ্র গোষ্ঠীটিই জাতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একক-রূপে গৃহীত। এখানেও নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উন্নীত হইতে পারা যায়, তবে এই পরার্থবাদের জন্মভূমিতে নিজ জাতির সকলকে লইয়া একত্র উন্নত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য, ক্ষমতা বা অন্য কোন গুণের দ্বারা নিজ গোষ্ঠীর লোকেদের পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নত জাতির লোকেদের সঙ্গে স্বাজাত্যের দাবী করিতে পার না। যাহারা তোমার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি কেহ উচ্চতর জাতিতে উন্নত হইতে চায়, তবে তাহার স্বজাতিকেও উন্নত করিতে হইবে—তাহা হইলে আর কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না।

ইহাই ভারতীয় স্বাঙ্গীকরণপদ্ধতি—সুদূর অতীত হইতে এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এ-কথা আরও বেশী করিয়া খাটে যে, আর্য ও দ্রাবিড়—এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে-ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নামগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ। উহারা কেবল গোষ্ঠীর মর্যাদাসূচক, এই গোষ্ঠীও সর্বদা পরিবর্তনশীল, এমন কি পরিবর্তনের শেষ ধাপে উপনীত হইয়া যখন বিবাহনিষেধ (non-marriage) প্রভৃতির মধ্যেই অন্য সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনও নিম্নতর জাতি বা বিদেশ হইতে আগত লোকদিগকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এই গোষ্ঠীগুলি প্রসারিত হইতেছে।

যে-বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ; ধনসম্পদ্ যাহাদের হাতে তাহারাই বৈশ্য।

যে-গোষ্ঠী আপন অভীষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই সে-গোষ্ঠী নবাগতদিগের নিকট হইতে নানা উপ-বিভাগের দ্বারা নিজেদের পৃথক্ করিয়া রাখে। কিন্তু শেষ অবধি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। আমাদের চোখের উপর ভারতের সর্বত্র এইরূপ ঘটিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই যে-গোষ্ঠীটি নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জন্য সব সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং উচ্চবর্ণেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—যখনই

সম্ভব হইয়াছে, রাজার সাহায্য এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রের দ্বারাও নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চাশা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহারা কি সফল হইয়াছিল?নিজেদের পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলি যত্ন সহকারে লক্ষ্য দেখ—বিশেষতঃ বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয় সংস্করণগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; দৃষ্টির সম্মুখে ও চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—উত্তর পাইবে।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপ-বিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহ-প্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা (যদিচ এই রীতি সর্বত্র পালিত হয় না) সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি বাদ ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত-পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত—রক্তগত নহে। বেদে দস্যুদের কুৎসিত আকৃতি সম্বন্ধে যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই মহান্ তামিলভাষীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। বস্তুতঃ আর্য ও তামিলদের মধ্যে কাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য বেশী—এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রতিযোগিতা হয়, তবে উহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহসী হইবে না।

বর্ণ-বিশেষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এই মতবাদ দাক্ষিণাত্যের মত অন্য কোথাও এতটা সাফল্য-লাভ করে নাই।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আমরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি নাই, সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমরা দাক্ষিণাত্যের এই সামাজিক অত্যাচারের কথা বেশী আলোচনা করিব না। মান্দ্রাজ-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অনিবার্য ত্রুটিবিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-নামের অযোগ্য কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক সুফল-লাভ ব্যাহত হইলেও এই বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের একটি জগৎসৃষ্টি—মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের এই আদর্শ ভুলিয়া না যান—মনে রাখেন।

যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করেন, তিনি নিজের সেই পবিত্রতার দ্বারা এবং অপরকেও অনুরূপ পবিত্র করিয়া নিজের দাবী প্রমাণ করুন। ইহার বদলে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগত গর্ব লালন করিতেই ব্যস্ত; স্বদেশী অথবা বিদেশী যে-কোন পণ্ডিত এই মিথ্যাগর্ব ও জন্মগত আলস্যকে বিরক্তিকর কুতর্কের দ্বারা লালন করেন, তিনিই ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া দাঁড়ান।

ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব—ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর, তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয়—শুধু সেবাভাবের দ্বারা। যে ভালভাবে সেবা করিতে জানে, সে-ই ভালভাবে শাসন করিতে পারে।

অব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেছেন—মূল সমস্যা-সমাধানের পক্ষে এ ধরনের কাজ নিতান্ত বিঘ্নস্বরূপ। অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন মাত্র।

বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে। ইহা বৌদ্ধদের রাজনীতিক বিভ্রান্তির পুনরাবর্তন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই ঘৃণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত কোলাহলের মধ্যে পণ্ডিত শবরীরয়ন ১ একটিমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধির পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। মূর্খোচিত নিরর্থক কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশক্তি নষ্ট না করিয়া তিনি 'সিদ্ধান্তদীপিকা'য় 'আর্য-তামিলগণের সংমিশ্রণ' নামক প্রবন্ধে অতিসাহসিক পাশ্চাত্য ভাষাবিদগণের সৃষ্ট মতবাদের কুয়াশাই শুধু ভেদ করেন নাই, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাতিসমস্যা-সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন।

ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও কিছু পায় নাই। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই লাভ করিয়া থাকি। যোগ্যতার প্রথম ধাপ পাওয়ার ইচ্ছা; আমরা—নিজেদের যাহা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া মনে করি, তাহাই লাভ করিয়া থাকি।

বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আর্য'-মতবাদের জাল এবং ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলি শান্ত অথচ দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির পূর্ববর্তী মহান্ তামিল-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্রসমূহে 'আর্য' শব্দটি যে-অর্থে দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসঙ্ঘকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়—সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ-কথা সব হিন্দুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে।

যদিও আমরা জানি যে, পণ্ডিত শবরীরয়ন কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ করিতেছেন, যদিও বৈদিক নাম ও জাতিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষিপ্র মন্তব্যসমূহের সহিত আমরা একমত নহি, তবুও আমরা এ-কথা জানিয়া আনন্দিত যে, তিনি ভারতীয় সভ্যতার মহান্ উৎস সংস্কৃতির (সংস্কৃতভাষী জাতিকে যদি সভ্যতার জনক বলা যায়) পূর্ণ পরিচয়লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি যে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো-সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্য-সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, তাহাতেও আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে-সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার সহিত তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্তসম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি।

আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্ট্ই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার-তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের বদ্বীপ-অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া তীরে তীরে উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে গিয়াছিল। এই পন্ট্কে তাহারা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত।

এই প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই আরও বিশদ ও নিখুঁত আলোচনা দেখি দিবে। তামিল-ভাষার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এ-কাজে যোগ্যতর আর কাহাকে পাওয়া যাইবে?

আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত, মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত, আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী

পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত—কারণ তাহারা মানবজাতিরও পূর্ববর্তী। জড় অথবা চেতন—এই সমগ্র বিশ্ব-জগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি—আবার কর্মাবসানে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মায়াতীত জগতে প্রবেশ করি, এজন্য আরও বেশী গর্ব অনুভব করি।

৪. ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

[Historical Evolution of India—প্রবন্ধের অনবাদ]

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

নাসতো সদ্ জায়েত।

অনস্তিত্ব হইতে কোন অস্তিত্বের উদ্ভব সম্ভব নহে। যাহা 'অসৎ', তাহা কোন সদ্বস্তুর হেতুও হইতে পারে না। শূন্যতা হইতে কোন বস্তু জাত হয় না।

কার্য-কারণ-নিয়ম আর্যজাতিরই মত সুপ্রাচীন। এই নিয়ম সর্বশক্তিমান্, কোন দেশ বা কালের সীমায় ইহা আবদ্ধ নয়। প্রাচীন ঋষি-কবিগণ ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং ইহাকেই ভিত্তিরপ্রস্তররূপে স্বীকার করিয়া আজ পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাহার জীবন-দর্শন রচনা করিয়া চলিয়াছে। ...

যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে এবং যদিও আদিযুগের প্রথম-প্রয়াসের মধ্যে কাঁচা-হাতের অপরিণত স্বাক্ষর ছিল—যেমন থাকে সুদক্ষ স্থপতির প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে, তথাপি নির্ভীক উদ্যম ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া সে এক বিস্ময়কর ফল প্রসব করিয়াছিল।

এই জিজ্ঞাসার সাহস আর্য-ঋষিদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টকখণ্ডের স্বরূপ-অনুসন্ধানে, উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের মাত্রানির্ণয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা ঐগুলির পুনর্বিন্যাসে। ইহারই প্রেরণায় পূজা- উৎসবাদির

তাৎপর্য সম্পর্কে কখনও তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কখনও ঐগুলির ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কখনও বা সেগুলি একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রচলিত দেবতাবর্গকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টারূপে যিনি কীর্তিত, যিনি পিতৃপুরুষের স্বর্গীয় পিতা—তাঁহার জন্য হয় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা এককালে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়াই এক সার্বভৌম ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সকল ধর্ম অপেক্ষা সেই ধর্মের অনুগামীর সংখ্যা আজও সর্বাধিক।

ইহারই অনুপ্রেরণায় যজ্ঞবেদীর ইষ্টকস্থাপন-ব্যবস্থা হইতে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার পূজা-উপাসনার যথাযথ কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, যাহা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

ঐ অনুসন্ধিৎসা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের দান প্রাচীন অথবা আধুনিক যে-কোন জাতির দান অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে ধাতুঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতের সুরগ্রাম-নির্ধারণে, বেহালা-জাতীয় তারযন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতিতে তাঁহাদের যে-প্রতিভা, তাহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যানের সাহায্যে অপরিণত শিশুমন গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আজও পৃথিবীর সর্বদেশে শৈশবের শিক্ষায়তনে শিশুগণ ঐ-সকল গল্পই শিখিয়া থাকে, আর ঐগুলির মধ্য দিয়াই জীবনের পটে সুস্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করে।

এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল এই জাতির অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে ‘কবির অন্তর্দৃষ্টি’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবিকল্পনার পুষ্পবেদীতে

স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম 'সংস্কৃত' বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সেই বিশ্লেষণশক্তি এবং নির্ভীক কবিকল্পনা, যাহা ঐ শক্তিকে প্রেরণা দিত—এই দুইটি অভ্যন্তরীণ কারণই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর, ঐ দুইটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্যজাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়-স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল, এবং ইহাই এই জাতির দার্শনিক চিন্তাধারার গোপন রহস্য; ইহা দক্ষকারিগর-নির্মিত ইস্পাত-ফলকের ন্যায়, যাহা লৌহদণ্ডকে ছেদন করিতে পারে, আবার বৃত্তাকারে রূপায়িত হইবার মত নমনীয়ও বটে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে তাহারা ছন্দ-গাথা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। মণি-মাণিক্যের ঐক্যতানে, মর্মর-প্রস্তরের বহু বিচিত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সুষমার সঙ্গীতে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সৃষ্টিতে—যে-সৃষ্টি এই জগতের বাহিরে অন্য এক রূপকথার জগতের বলিয়া মনে হইত, সব কিছুর পশ্চাতে এই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সহস্রবর্ষব্যাপী সাধনা নিহিত ছিল।

কলা, বিজ্ঞান, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত—সব কিছু এমন ছন্দোময় ভাবদ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, চরমে ইন্দিয়ানুভূতি অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত।

এ-জাতির দূর-অতীত ইতিহাসের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়, সেই আদিমযুগেই—ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করিবার যন্ত্র-হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য তাহাদের আয়ত্তে ছিল। বেদ-গ্রন্থে এই জাতির জীবনাখ্যায়িকা চিত্রিত হইবার পূর্বে চলার পথে বহু প্রকারের ধর্ম ও সমাজ পশ্চাতের পথরেখায় নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সেখানে দেখা যায়—এক সুসংবদ্ধ দেবতামণ্ডলী, উৎসবাদির বিস্তারিত ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাগিদে গঠিত বংশানুক্রমিক একটি সমাজ। সেখানে ইতিমধ্যেই অনেক প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী বর্তমান।

আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় জলবায়ু এবং ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি তখনও এই জাতির উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আরও কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। তখন দেখা গেল এক মানবগোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা—মধ্যে দিগন্তবিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চল, আর তাহাদেরই মধ্য দিয়া দুর্বারগতি নদীসমূহ প্রচণ্ড স্রোতে প্রবাহিত। তাতার, দ্রাবিড়, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ক্ষণিক আভাস পাওয়া যায়; শেষে দেখা যায় ইহাদেরই শোণিতধারা, ভাষা ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির নির্ধারিত অংশ-সংযোগে ধীরে ধীরে আর্যদেরই অনুরূপ আর এক মহান্ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা আরও শক্তিশালী—উদার অঙ্গীভূত-করণের ফলে অধিকতর সম্বদ্ধ।

আরও দেখা যায়, এই কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী গ্রহণ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়াও বিশেষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের 'আর্য'-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরাপর জাতিকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াও আর্যজাতির অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করিতে সম্মত নয়।

ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তম সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিমযুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধিনিয়ম-প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক

চিন্তা দেখা দিল, এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল।

সে এক দ্বন্দ্বের কাল। ...

একদিকে পুরোহিতকুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই ক্রিয়াকর্মকেই সমর্থন করিত, যেগুলির জন্য সমাজব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য। আবার অন্যদিকে যে রাজন্যবর্গের শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত—পরিচালিত করিত এবং যাঁহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মননক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠানদক্ষ পুরোহিতবর্গকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে আর সম্মত ছিলেন না। আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

সাধারণত মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারতভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

এ বিরোধের প্রথম সমাধান-প্রচেষ্টা শুরু হয় ভাব-সমীকরণের সূত্র অনুসরণ করিয়া, ইহাই স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে একই সত্য বিভিন্নভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিল।

এই চিন্তাধারার মহান্ নেতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁহারই উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ও বিপর্যয়ের পর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ

অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ জীবনদর্শন-রূপে 'গীতা' স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ণাধিকারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য রাজন্যবর্গের যে দাবী এবং পুরোহিতকুলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ-জনিত যে উত্তেজনা, তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও তাহার মূলীভূত হেতু যে সামাজিক বৈষম্য, তাহা তখনও দূর হইল না, রহিয়াই গেল। শ্রীকৃষ্ণ জাতিনির্বিশেষে সকলের সম্মুখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যা তিনি স্পর্শ করেন নাই। সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাই দেখা যায়, বর্তমান কালের ভারতবর্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক সমতা স্বীকৃত হইলেও সামাজিক বৈষম্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, সেই সামাজিক বৈষম্যের বিরোধ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নূতন শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের নেতৃত্ব প্রাচীন আচার-ব্যবস্থাদি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বিশেষ-অধিকারভোগী পুরোহিতবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, বৈদিক দেবতাদিগকে বৌদ্ধাচার্যগণের ভৃত্যশ্রেণীতে অবনমিত করিয়াছিল; সেইসঙ্গে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে, 'স্রষ্টা' বা 'সর্বনিয়ন্তা' বলিয়া কিছু নাই, উহা পুরোহিতগণের আবিষ্কার অথবা কুসংস্কার মাত্র।

পূজানুষ্ঠানে পশুবলি নিবারণ করিয়া, বংশগত জাতিভেদ ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য লুপ্ত করিয়া এবং আত্মার নিত্যত্বে অবিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। বৌদ্ধধর্ম কখনও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধগণ একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিল, কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া

তুলিয়াছিল, আর যজ্ঞবেদীর স্থানে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ভাবেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। ...

খুব সম্ভব এই সংস্কারকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রাচীন শক্তিসমূহ কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে নাই, তথাপি বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের মত প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধি-চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ-পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

আধিপত্য লাভের জন্য কুরু-পাঞ্চাল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াছিল, সে-যুদ্ধের ইতিহাস প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারতের' মাধ্যমে আমরা পাইয়াছি। পূর্বাঞ্চলে মগধ ও মিথিলাকে ঘিরিয়াই আধ্যাত্মিক প্রাধ্যান্য আবর্তিত হইয়াছিল এবং কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের অবসানে মগধের রাজশক্তি কতকটা প্রাধান্য লাভ করে।

এই পূর্বাঞ্চলই বৌদ্ধদিগের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তাহাদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। আবার যখন মৌর্য নরপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের ক্ষতিকর কুলকলঙ্কচিহ্ন স্খালন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ নূতন আন্দোলনকে—শুধু সমর্থন নয়—পরিচালিতও করিয়াছিলেন, তখন নূতন পুরোহিত-শক্তি পাটলিপুত্রের রাজশক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং নূতন প্রাণশক্তি যেমন মৌর্য রাজন্যবর্গকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌রূপে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মৌর্যরাজশক্তির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ...

এ কথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বাহিরের কোন সাহায্য গ্রহণে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ইহারই ফলে বৈদিক ধর্ম যেমন শুচিতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তেমনি অনেক হীন প্রভাব হইতেও নিজেকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু প্রচারের অতি উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সেটি সম্ভব হয় নাই।

অত্যধিক গ্রহণ প্রবণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই হারাইয়া ফেলে, এবং জনপ্রিয়তার চরম আগ্রহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মূল বৈদিক ধর্মের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধধর্মের উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি-উপাসনা, মন্দিরে শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়া যথাসময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সীথিয়ানদের ভারতাক্রমণ এবং পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। এই আক্রমণকারীর দল নিজেদের বাসভূমি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রচারকদের আক্রমণে ইতঃপূর্বে ক্রোধদীপ্ত হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূর্যোপাসনার সহিত নিজেদের সৌরধর্মের প্রভূত সাদৃশ্য তাহারা লক্ষ্য করিল এবং যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বহু আচারপদ্ধতি নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, তখন সহজেই তাহারা ব্রাহ্মণদের পক্ষ অবলম্বন করিল।

তারপরই এক অন্ধকারময় যুগের কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল—যাহার দীর্ঘ ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ প্রসারিত। কখনও যুদ্ধের কোলাহল ও আর্তনাদ, কখনও ব্যাপক নরহত্যার জনশ্রুতি—এই ছিল সে-কালের পরিস্থিতি, আর তাহার অবসানে এক নূতন অবস্থায় নূতন দৃশ্যের সূচনা হইয়াছিল।

তখন আর মগধ-সাম্রাজ্য নাই। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত পরস্পর-বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ কর্তৃক শাসিত হইতেছে। পূর্বাঞ্চলে ও হিমালয়ের সন্নিহিত কোন কোন প্রদেশে এবং সুদূর দক্ষিণে ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়। আর সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বংশানুক্রমিক পুরোহিত-শক্তির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতি জাগিতেছে; জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, জাতির জীবন একদিকে বংশগত ব্রাহ্মণের, অন্যদিকে নবযুগের বর্জনশীল সন্ন্যাসীর—এই দ্বিবিধ পৌরোহিত্যের কবলে; এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বৌদ্ধসংগঠনী-শক্তির অধিকারী হইলেও বৌদ্ধদের মত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না।

ইহার পর প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুত-জাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞানকেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নবভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্যমণ্ডিত।

নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখে দায়িত্ব ছিল গুরুতর, সমস্যা ছিল বিরাট, যে-সমস্যা পূর্বপুরুষদের সম্মুখেও কখনও উপস্থিত হয় নাই।

তুলনীয় অবস্থাটি ছিল এইরূপঃ প্রথম যুগের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সংহত জাতি; একই রক্তস্রোত যাহাদের মধ্যে প্রবাহিত, যাহাদের ভাষা এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকারবেষ্টনীর অন্তরালে নিজেদের ঐক্য-সংরক্ষণে যাহারা নিয়ত

যত্নশীল—সেই জাতিই বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে বহু সংযোজন ও বিস্তারের ফলে এক বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছিল। আবার বর্ণ, ভাষা, ধর্মসংস্কার, সামাজিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি বিপরীত প্রভাবে সেই জাতিই বহু বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এখন সেইগুলিকে একটি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে গড়িয়া তোলাই এক প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৌদ্ধগণও অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার আয়তন ও গুরুত্ব এত বিস্তৃত ছিল না। তখন পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল—আর্যজাতিভুক্ত হইবার জন্য যে-সকল মানবগোষ্ঠী আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে স্বকীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া বহুবিচিত্র উপাদান-সমন্বিত এক বিরাট আর্যদেহ গড়িয়া তোলা। ... বিশেষ সুবিধাদানের এবং আপসের মনোভাব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মরূপে বিরাজিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের ইতরজাতি-সুলভ ইন্দ্রিয়াসক্তিবহুল উপাসনার প্রলোভন আর্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে সংযোগ দীর্ঘতর কালের জন্য স্থায়ী হইলে আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইত। ইহার পর স্বভাবতই আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং নিজবাসভূমিতে স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়রূপে বৌদ্ধধর্ম আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল ভট্ট এবং দক্ষিণ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজাপদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে দেখা দিত সাময়িক সংস্কার-আন্দোলন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। পরে তাহাতে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদসমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

এই আন্দোলন ব্যাসদেবের মীমাংসা-দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গীতাকে পুরোভাগে স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালের যাবতীয় আন্দোলন ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞানমার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে-আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব-ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন। উত্তরাঞ্চলে সে প্রতিক্রিয়ার পরেই মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার অবসান ঘটিলে উত্তর-ভারত যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর সে-নিদ্রা রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান অশ্বারোহিদলের বজ্রনিনাদে।

যাহা হউক, দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এ-দেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল। কাজেই দক্ষিণ-ভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল; আর, এক সমুদ্রতীর হইতে অন্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারত—মধ্য-এশিয়ার বিজেতাদের পাদমূলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-বিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানা প্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধৃবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্‌গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।

মুসলমানযুগে উত্তর-ভারতে বিজয়ী জাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস; তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।

রামানন্দ, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এবং মুসলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থনকারী; কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।

এইকালে উত্তর-ভারতে একজন শক্তিমান্ দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল-দরবারেও তদানীন্তন কালে যে-প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজ-

দরবার কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক্ হইতে এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ...

তারপর আবার এক বিশৃঙ্খলার যুগ উপস্থিত হইল। শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী, ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিক্‌দল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল যুদ্ধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূমধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজশক্তি। সেই শক্তির শাসনাধীনেই অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া দেশে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা অব্যাহত। অবশ্য সে-শৃঙ্খলা যথার্থ উন্নতির দ্যোতক কিনা—কালের নিকষেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।

দিল্লীর বাদশাহী আমলে উত্তর-ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি যে-ধরনের ধর্ম-আন্দোলন করিত, ইংরেজ আমলেও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সে-ধরনের কিছু কিছু আন্দোলন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে-সব ছিল যেন মৃত বা মৃতকল্পের কণ্ঠধ্বনির মত—ভয়ার্ত এক জাতির শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারের জন্য ক্ষীণ আবেদন। বিজেতাদের রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের ধর্মগত ও সমাজগত যে-কোন পরিবর্তন সাধন করিতে তাহারা একান্ত উদ্‌গ্রীব, বিনিময়ে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকুই ছিল তাহাদের প্রার্থনা। আর ইংরেজ-শাসনে বিজেতাদিগের সহিত তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক পার্থক্যই ছিল স্পষ্টতর।

মনে হয়, এ-শতকের হিন্দু-সম্প্রদায়গুলির একটি মাত্র আদর্শ ছিল—তাহাদের ইংরেজ প্রভুর সমর্থন-লাভ। কাজেই ইহাদের অস্তিত্ব যে ব্যাঙের ছাতার মত ক্ষণিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতের বৃহৎ জনসমাজ অতি নিষ্ঠার সহিত এই সম্প্রদায়গুলিকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত। জনসাধারণের কাছে ইহাদের স্বীকৃতি ছিল মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ এগুলি লোপ পাইলেই যেন তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল এইরূপ চলিবে, অন্যরূপ হইতে পারে না।

৫. সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ

[জাস্টিস রানাডে-কর্তৃক প্রদত্ত Social Conference Address-এর সমালোচনা; ‘Prabuddha Bharata’ ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ১৯০০ খ্রীঃ ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত।]

আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে শুনেছিলাম, ‘সাহেবদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—কিন্তু দোআঁশলা জাতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নন, অন্য কেউ।’

আজ হঠাৎ একটা জিনিষ পড়ে আমাদের ঐ ভাবের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা কি খুলে বলি।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোৎসাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ মিঃ জাস্টিস রানাডের প্রারম্ভিক অভিভাষণ কিছু দিন হল আমাদের কাছে এসে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে। পাঠ করে দেখা গেল, ওতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাঁটি উপদেশ সব দেওয়া হয়েছে—আর এগুলি এত ভাবের সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে—বাস্তবিকই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু বক্তৃতাটির শেষ ভাগটায় একটা প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবল নূতন সম্প্রদায়টির জন্য একদল আচার্য গঠন করবার পরামর্শ দেওয়া হযেছে; দেখা গেল—বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ ঐ সম্প্রদায়টির নাম করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, তিনি আর্য সমাজকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছেন—যে-সমাজটি, স্মরণ রাখবেন, জনৈক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশটা পাঠ করে আমাদের একটু বিস্ময় বোধ হল। আমাদের মনে

স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠল যে, ঈশ্বর তো দেখছি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করলে কে?

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাসী ছিল ও আছে—হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী; এমন কি যে-ইসলামধর্মে সন্ন্যাসকে অস্বীকার করবার একটা উৎকট ভাব আছে, তা থেকে একটু নরম সুরে নেমে ইসলামপন্থীদেরও দলকে দল ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের—কেউ পুরা মাথা-কামান, কেউ খানিকটা কামান, দীর্ঘকেশ, হ্রস্বকেশ, জটাজুটধারী এবং অন্যান্য নানাবিধ ঢঙের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছেন।

আবার এঁদের পোশাকের তারতম্যও অনেক—কেউ দিগম্বর, কেউ চীরপরিহিত, কেউ কাষায়ধারী, কেউ পীতাম্বর—আবার কৃষ্ণাম্বর খ্রীষ্টান ও নীলাম্বর মুসলমান রয়েছেন। আবার ঐ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নানারূপে দেহকে কষ্ট দিয়ে তপস্যার পক্ষপাতী, অপর একদল বলেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্', 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।' প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই সন্ন্যাসীর ভিতর একদল যোদ্ধা ছিল—নাগা-সন্ন্যাসীর দল চিরকালই ছিল। পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির ভিতরও একই ত্যাগের ভাব এবং সদৃশ শক্তিপ্রকাশ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখায় চলে আসছে। সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ও বরাবর ছিল, এখনও আছে। মিঃ রানাডে শুধু যে ভারতীয় সমাজিক সম্মেলনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেছেন তা নয়, তিনি নারীজাতির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে সদা-বদ্ধপরিকর একজন মহাশয় ব্যক্তিও দেখছি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ন্যাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে বলে বোধ হচ্ছে। প্রাচীনকালের অবিবাহিত ব্রহ্মবাদিনীরা, যাঁরা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি, তাতে বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর আশঙ্কা নেই —এই রকমই মনে হয়; আর মিঃ রানাডের মতে—পুরুষরা সন্ন্যাসী হয়ে

যেমন মানবীয় অভিজ্ঞতার পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নারীরাও সেই একই প্রকার কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করে ঐরূপ বঞ্চিত হয়েছেন, তা বোধ হয় না।

সুতরাং আমরা প্রাচীন সন্ন্যাসিনীকুল ও তাঁদের আধুনিক আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ রানাডের সমালোচনা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ছেড়ে দিলাম।

তা হলে চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই শুধু মিঃ রানাডের সমালোচনার সব চোটটা সহ্য করতে হচ্ছে। এখন দেখা যাক, এই চোটটা খেয়েও সে সামলে উঠতে পারে কিনা।

আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের প্রথা, তার প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশটাতে—যে দেশটাতেই এত 'সমাজসংস্কার'-এর দরকার বলে বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসী গুরু ও গৃহস্থ গুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্মাচার্য—উভয় প্রকার আচার্যই বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। 'সকল বিষয়ে চৌকস্',—সব বিষয়ের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সোমপায়ী বিবাহিত গৃহস্থ ঋষিদেরই প্রথম অভ্যুদয় হয়েছিল, অথবা মানবোচিত অভিজ্ঞতাহীন সন্ন্যাসী ঋষিই প্রথমে হয়েছিলেন—এখন অবশ্য এ সমস্যার একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ রানাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উড়ো কথার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে আমাদের জন্য এই সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন প্রাচীনকালের 'বীজ ও বৃক্ষ'-এর সমস্যার মত এই একটা সমস্যাই থেকে যাবে।

কিন্তু উৎপত্তির ক্রম যাই হোক, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত সন্ন্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থ আচার্যগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সেই ভিত্তি হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীবহত্যাকারী যাজ্ঞিকগণ উপনিষদ্বক্তা হতে পারলেন না কেন?—জিজ্ঞাসা করি, কেন?

একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম করে বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরনের! আবার অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষিগণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান করে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তি লাভ করেছিলেন, এবং যা পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিন-চার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজসংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি পর্যন্ত দান করছে।

বর্তমান কালে আমাদের সমাজসংস্কারকগণের বেতন ও সুবিধাগুলির তুলনায় ভিক্ষু-সন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীর নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্যের তুলনায় সমাজসংস্কারকগণ কি কাজই বা করে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো আর আধুনিকদের মত নিজের বিজ্ঞাপন নিজে প্রচার করবার, নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপায়টা শেখেননি।

এ জগৎটা যেন কিছুই নয়, একটা স্বপ্নমাত্র—এ ভাবটা হিন্দু মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত—কিন্তু পাশ্বাত্যগণ এর পরে আর কিছু দেখে না, তাই সে চার্বাকের মত সিদ্ধান্ত করে বসে, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।' এই পৃথিবীটা একটা দুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র, এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ করে নেওয়া যাক। হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—এই জগৎ যতদূর সত্য, তার চেয়েও অনন্তগুণে সত্য; সুতরাং ঈশ্বর ও আত্মার জন্য জগৎটাকে ত্যাগ করতে হিন্দু প্রস্তুত।

যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এইরূপ চলবে, আর আমরা ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিগণ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা করতে পারেন?

আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইওরোপে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙালী সংস্কারকগণ তাঁদের কাছ থেকে ঐটি ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ সেটি আঁকড়ে ধরেছেন—অবিবাহিত থাকার দরুন সন্ন্যাসীরা জীবনের 'পূর্ণ উপভোগ ও নানা রকমের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত।' আশা করি, এইবার ঐ মড়াটা চিরদিনের জন্য আরব সাগরে ডুবে যাবে—বিশেষতঃ এই প্লেগের দিনে আর হয়তো ঐ স্থানের উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের পরম সৌরভময় শবদেহের প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে,—তাঁদের পূর্বপুরুষের বিবরণ নির্ণয় করতে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূল্য আছে স্বীকার করা যায়—তা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ছে বলি—ইওরোপে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাই বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন; তাঁদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও তাঁরা 'জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা'র রসাস্বাদ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে এ-কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটি বৃত্তি দিয়েছেন—কোন না কোন ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তিনি অন্যায় কাজ করেছেন—তিনি পাপী। বেশ, তা হলে তো কাম ক্রোধ চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন—আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনের সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি ঐগুলিও পুরাদমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা

যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তাও ভাল রকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এই প্রশ্নের 'হাঁ'-জবাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্রস্বভাব বিশ্বামিত্র অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের, বিশেষতঃ নারীর সাহচার্যে 'পুরামাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী' বশিষ্ঠবংশের অনুসরণ করতে হবে?—কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থ ঋষিই বৈদিক সূক্ত পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন, তখন সেখানেই পুত্রোৎপাদনের বিষয়ে উদারতার জন্যও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ—এঁদের অথবা যে-সকল অবিবাহিত সন্ন্যাসী ঋষি ব্রহ্মচর্যকেই ধর্মের মূলমন্ত্র বলে প্রচার করে গেছেন, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব?

তারপর অবশ্য ভ্রষ্টের দল তো রয়েছেই, তাদের মাথায় তো গালাগালের বোঝা পড়াই উচিত—যে-সকল সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ ঠিক ধরে রাখতে পারেননি, সেই দুর্বল অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীর দল।

কিন্তু আদর্শটি যদি খাঁটি ও সরল হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ চলতি কথাতেই আছে—'ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল।' যে কখনও উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সেই কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় ভ্রষ্টসন্ন্যাসী তো বীর।

আমাদের সমাজসংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের খবর যদি ভাল করে নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদের ভাল করে গুনতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজকর্মের এ-রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যে-দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয়-মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারও কিছু সাহায্য চাইছে না, জীবনে যত ঝড়-ঝাপটা আসছে সব বুক পেতে নিচ্ছে—কাজ করছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমন কি কর্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণে পরিচিত, সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কাজ চলছে—আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ

চলছে—কারণ ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে তাকে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্যের মূলে নেই।

এ কেবল সন্ন্যাসীই পারে। ধর্মের কথা কি বল? তা থাকা উচিত, না একেবারে অন্তর্হিত হবে? ধর্ম যদি থাকে, তবে কর্মসাধনে বিশেষ অভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক—ধর্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তিনি ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈন্যস্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্মের বিনাশাশঙ্কা?

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছে কেন?

বেঁচে থাকুন রানাডে ও সমাজসংস্কারকদল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত, বৎস, ভুলো না, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছ না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা।

৬. ভারতের মানুষ

[১৯৯০ খ্রীঃ ১৯ মার্চ, সোমবার 'ওকল্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার'-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ বক্তৃতাটির সারমর্ম প্রকাশিত।]

সোমবার রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন পর্যায়ে 'ভারতের মানুষ' সম্পর্কে যে ভাষণ দেন, তা শুধু সে-দেশের লোকের সম্বন্ধে তথ্য-বর্ণনার জন্যই নয়, এরূপ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েও তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কার-সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তার জন্যই মনোজ্ঞ হয়েছিল। বস্তুতঃ বালবিধবা, নারী-পীড়ন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এরূপ নানা বর্বরতার অভিযোগের আলোচনা শুনে শুনে তিনি স্পষ্টতই অনেকটা বিরক্ত হয়েছেন এবং উত্তরে পাল্টা অভিযোগ করার কিছুটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ভারতবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতে ঐক্যের বন্ধন হল ধর্ম, ভাষা বা গোষ্ঠী (race) নয়। ইওরোপে গোষ্ঠী (race) নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায়—যদি ধর্ম এক হয়, তবে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে।

উত্তর-ভারতের মানুষকে চারটি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণ-ভারতের ভাষাগুলি এতই স্বতন্ত্র যে, কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর-ভারতের লোকেরা মহান্ আর্যজাতিসম্ভূত—যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার (Pyrenees) বাস্‌ক্ জাতি (Basques) এবং ফিন্ জাতি (Finns) ভিন্ন সমগ্র ইওরোপের মানুষ উদ্ভূত বলে অনুমিত হয়। দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসিগণ প্রাচীন মিশর বা সেমিটিক জাতির সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষে পরস্পরের ভাষা-শিক্ষার অসুবিধার কথা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেন যে, যখন তাঁর দক্ষিণ-ভারতে যাবার সুযোগ হয়েছিল,

তখন সংস্কৃত-জানা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদ দিয়ে তাঁকে স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলতে হত।

জাতিভেদ-প্রথার আলোচনাতেই বক্তৃতার অনেকাংশ নিয়োজিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে স্বামীজী বলেনঃ প্রথাটি অবশ্যই এখন খারাপ দিকে যাচ্ছে, পূর্বে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই ছিল বেশী, অপকারিতার চেয়ে উপকারিতাই ছিল বেশী। সংক্ষেপে বলা চলে, পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই প্রথা মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, তেমনি আবার সম্মিলিতও করেছে, কারণ এক শ্রেণী বা জাতি-ভুক্ত ব্যক্তি তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ, এবং যেহেতু কোন ব্যক্তিই তার নিজের শ্রেণী বা জাতির গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, সেজন্য অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য-বিস্তারের যে-সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, হিন্দুদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

জাতিভেদের সবচেয়ে মন্দ দিক হল এই যে, এতে প্রতিযোগিতা দমিত থাকে এবং প্রতিযোগিতার অভাবই বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজনীতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কারণ।

বহু-আলোচিত বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল বলে মনে করে না, কারণ যে-কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অবশ্যই বড়। ‘আমি জেনীকে ভালবাসি এবং জেনী আমাকে ভালবাসে—অতএব আমাদের এই বিবাহ করতে হবে’—এ-যুক্তির কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বালবিধবাদের শোচনীয় অবস্থার যে-চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, তার সত্যতা অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, ভারতে সাধারণভাবে বিধবাদের বিস্তর প্রতিপত্তি, কারণ সে-দেশে সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। বস্তুতঃ বিধবারা এমন একটা স্থান অধিকার করে

আছে যে, মেয়েরা এবং হয়তো পুরুষরাও পরজন্মে 'বিধবা' হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনাও করে থাকে!

বিবাহের পূর্বেই মারা গেছে—এমন বালকদের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা যে-সব মেয়ে, তাদের ও বালবিধবাদের প্রতি করুণা-প্রদর্শন সাজত তখনই, যদি বিবাহই জীবনের একমাত্র বা মূল উদ্দেশ্য হত। কিন্তু হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য, কোন বিশেষ অধিকার ও সুযোগ নয়; এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার না থাকা বিশেষ একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়।

৭. ভারতের রীতিনীতি

[১৮৯৪ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুআরী বৃহস্পতিবার ডেট্রয়েটে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বিবরণী– ‘ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস’-এর সম্পাদকীয় বক্তব্য সহ।]

গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে হল-ভরতি শ্রোতৃবৃন্দ খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ করে, তিনি তাঁর দেশের রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে বলেন। তাঁর বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহারে শ্রোতারা আনন্দিত হয়; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা তাঁর বক্তৃতা শোনে, মাঝে মাঝে উচ্চ করতালি-ধ্বনি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত সুবিখ্যাত বক্তৃতার চেয়েও তাঁর এই বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল অধিকতর জনপ্রিয়। ভাষণটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল; বিশেষতঃ সেই অংশগুলি, যেখানে বক্তা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর স্বদেশবাসীদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থার সুনিপুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও দার্শনিক (এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক) প্রসঙ্গেই এই প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী এবং যখন তিনি প্রকৃতির মহৎ ও সহজ নৈতিক নিয়মের বিবেক-সম্মত কর্তব্যের কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিত কোমল কণ্ঠস্বর (যা তাঁর জাতির বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ভঙ্গি অনেকটা একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতই মনে হচ্ছিল। শ্রোতাদের নিকট কোন নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় ছাড়া তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় তাঁর বাগ্মিতায় চরমোৎকর্ষ দেখা যায়।

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ভারতে নৈতিকতার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশপ নিন্‌ডে (Bishop Ninde)। সানন্দচিত্তে বিবেকানন্দের পরিচয় প্রদান করে তিনি ভারতের আশ্চর্য বস্তু সম্বন্ধে ও সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধির উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেন। পাগড়ি-মাথায় উজ্জ্বল আলখাল্লা-পরা এবং বুদ্ধিদীপ্ত-চক্ষুবিশিষ্ট সেই শ্যামবর্ণ ভদ্রমহোদয় যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলের সামনে

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক মনোমুগ্ধকর মূর্তি। বিশপের সহৃদয় বাক্যের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁর স্বদেশের জাতিভেদ, লোকের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেনঃ

মূলত উত্তর-ভারতে চারটি ভাষা এবং দক্ষিণ-ভারতে চারটি, কিন্তু ধর্ম উভয়ত্র এক। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হিন্দু এবং এই হিন্দু জাতিটি কিছুটা অদ্ভুত। ধর্মীয় রীতি অনুসারে হিন্দু সব কাজ করে; ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সে আহার করে, প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, ধর্মের নির্দেশ অনুসারে সে সৎকর্ম করে এবং অসৎ কাজও করে ধর্মভাবে।

এই সময়ে বক্তা তাঁর ভাষণের শ্রেষ্ঠ নৈতিক সার কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস—সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। অতএব হিন্দুর মতে নিজের জন্য গৃহনির্মাণ স্বার্থপরতা; হিন্দু গৃহনির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা এবং অতিথিসেবার জন্য। নিজের জন্য আহার্য-রন্ধন স্বার্থপরতা; তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার সেবা করে অবশেষে সে নিজে আহার্য গ্রহণ করে—এই ভাবটি দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। যে কেউ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা থাকবে।

জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত—একজন ছুতোর-মিস্ত্রীর ছেলে ছুতোর হয়েই জন্মায়; স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। তবে এই সামাজিক দোষত্রুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, এ প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র; কালের এই পরিণাম ভারতে খুব দীর্ঘ বলে বিবেচিত হয় না, যেমন মনে করা হয় এদেশে বা অন্য সকল দেশে।

দু-রকমের দান বিশেষভাবে সমাদৃত—শিক্ষাদান এবং প্রাণদান। কিন্তু শিক্ষাদানই অগ্রাধিকার লাভ করে। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা খুব ভাল; তাকে শিক্ষাদান করা তার চেয়েও ভাল। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া গর্হিত কাজ এবং যে-ব্যক্তি ব্যবসার সামগ্রীর মত শিক্ষার বিনিময়ে কাঞ্চন গ্রহণ করে, তার উপর ধিক্কার বর্ষিত হয়। সরকার

মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য করে থাকেন। তার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে যে- পরিবেশ বজায় আছে, এখানে নৈতিক ফলাফল তার চেয়ে শুভকর হয়েছে।

বক্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বেড়িয়েছিলেন, সভ্যতার সংজ্ঞা কি? প্রশ্নটি তিনি আরও বহু দেশে জিজ্ঞাসা করেছেন। কখনও উত্তর পেয়েছেন, 'আমরাই হলাম সভ্যতার মাপকাঠি।' তিনি সবিনয়ে জানান—শব্দটির সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মত অন্য রকম। কোন জাতি হয়তো প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে, জনহিতকর প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান করে ফেলতে পারে, তথাপি এ কথা তাদের বোধগম্য নাও হতে পারে যে, যে-ব্যক্তি নিজেকে জয় করার শিক্ষা লাভ করেছে, সেই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা পরিস্ফুট। পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে এই পরিবেশটি ভারতে অধিক বর্তমান, কারণ সেখানে বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখতে সচেষ্ট এবং প্রকৃতিকেও একই ভাবে দেখে। এখানেই দেখা যায়—ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসকে অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার মত ধীর মনোভাব; এই অবস্থায় অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে এখানে অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। এই দেশ ও জাতির ভেতর থেকে একটি অফুরন্ত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে, যা দেশ-বিদেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরা সহজেই ঘাড় থেকে পার্থিব বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে যে প্রাচীন রাজা আদেশ করেছিলেন, 'আর কোন রক্তপাত বা কোন যুদ্ধ করা চলবে না' এবং যিনি সৈনিকের বদলে পাঠিয়েছিলেন একদল শিক্ষক, তিনি জ্ঞানীর মত কাজই করেছিলেন, যদিও বাস্তবতার দিক্ থেকে দেশ তার ফলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বল-প্রয়োগকারী বর্বর জাতিগুলির অধীনতা স্বীকার করলেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা চিরকাল বেঁচে আছে; কারও সাধ্য নেই, সেটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাত সহ্য করার মত খ্রীষ্টসুলভ নম্রতা ভারতের মানুষের আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের আত্মা উজ্জ্বলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরূপ দেশে 'ভাবপ্রচার'-এর জন্য কোন খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের ধর্ম

মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক এবং মনুষ্য-পশু-নির্বিশেষে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তোলে। নৈতিকতার দিক্ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারত উচ্চে। মিশনারীরা যদি কেবল সেখানকার পবিত্র বারি পান করতে বা সেই মহান্ জাতির উপর বহু পবিত্র জীবনের কী অপূর্ব প্রভাব পড়েছে—তা দেখতে যান, তবেই ভাল করবেন।

তারপর বক্তা বিবাহের রীতিনীতি ও প্রাচীনকালে যখন সহশিক্ষা-প্রথার প্রচলন ছিল, তখন নারীদের যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত, তার বর্ণনা করেন। ভারতের ঋষিদের লেখায় প্রত্যাদিষ্ট নারীর অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই পুরুষ, কিন্তু ভারতের পূতচরিত্র নারীগণ ধর্মগ্রন্থসমূহর উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটি, তার মধ্যে একটি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা; আর একটি হল মূক প্রাণীর সেবা, এই উপাসনাটি আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা শক্ত। ইওরোপীয়দের পক্ষেও এই ভাবটি উপলব্ধি করা সহজ নয়। অন্যান্য জাতি পাইকারী হারে প্রাণী হত্যা করে এবং নিজেরাও পরস্পর হানাহানি করে মরে, রক্তের সমুদ্রে তারা বাস করে।

একজন ইওরোপীয় বলেছিল, ভারতবাসীরা যে প্রাণী হত্যা করে না, তার কারণ তারা মনে করে, প্রাণীদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা আছে। পশুর স্তর থেকে যারা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, তাদের পক্ষেই এ-ধরনের যুক্তি সাজে। আসলে এটা ভারতের এক শ্রেণীর নাস্তিকের উক্তি—এ ভাবে তারা বেদের 'অহিংসা ও পুনর্জন্মবাদ'-এর দোষ দর্শন করে থাকে। এ রকম ধর্মীয় মতবাদ কোনকালে ছিল না। এটা জড়বাদী বিশ্বাস। মূক প্রাণীর উপাসনার একটি উজ্জ্বল চিত্র বক্তা তুলে ধরেন।

ভারতের অপূর্ব বিধি অতিথিপরায়ণতা একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি চিত্রিত করেন। একদা দুর্ভিক্ষের দরুন এক ব্রাহ্মণকে—তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূসহ কিছুকাল অনাহারে কাটাতে হয়। গৃহস্বামী খাদ্যের অন্বেষণে বাইরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ ছাতু সংগ্রহ করে আনেন; বাড়িতে এসে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করেন এবং যখন সেই ছোট্ট পরিবারটি আহার

করতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। আগন্তুক একজন ক্ষুধার্ত অতিথি। ভাগগুলি তখন অতিথির সামনে দেওয়া হল এবং সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলে গেল, আর এদিকে অতিথি-সেবাপরায়ণ সেই চারজন মৃত্যু বরণ করল। আতিথেয়তার পবিত্র নামে ভারতে যা আশা করা যায়, এই গল্পটি তারই আদর্শ-রূপে বলা হয়ে থাকে।

সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করেন। তাঁর বক্তব্য আগাগোড়া সহজ সরল; কিন্তু যখনই তিনি কোন চিত্র বর্ণনায় রত হন, তখন তা অপূর্ব কাব্যের মত শোনায়, তা থেকে প্রমাণিত হয়, পূর্বদেশীয় ভ্রাতা প্রকৃতির সৌন্দর্য কত গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর অপরিমিত আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ শ্রোতাগণ অনুভব করেন, কারণ তা চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসা-রূপে এবং সমন্বয়ের ঐশী বিধান ও কল্যাণকর অভিপ্রায়ের বিচিত্র কার্যরীতির গভীরে প্রবেশ করবার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি-রূপে স্বতঃপ্রকাশিত।

৮. ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ?

[ডেট্রয়েট শহরে একটি ভাষণের বিবরণী ১৮৯৪ খ্রীঃ ৫ এপ্রিল তারিখের 'বোষ্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছেঃ]

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট শহরে আসিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর নরনারী তাঁহার ভাষণ শুনিতে আসিত, বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণ তাঁহার অভিমতের অকাট্য যুক্তিজাল দ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট হইতেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, একমাত্র স্থানীয় নাট্যশালাটিতেই তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইত। তিনি অতি বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন, দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাঁহার, স্বভাবও তেমনই সুন্দর। ডেট্রয়েট শহরের সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার বিবরণী প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট স্থান দিয়াছে।

'ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ' পত্রিকা একদিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেনঃ বেশীর ভাগ লোকই মনে করিবেন যে, গত সন্ধ্যায় নাট্যশালায় প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ এই নগরে প্রদত্ত অন্য বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থ এবং বিকৃত খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দেন, কোন্ অর্থে তিনি নিজেকে একজন খ্রীষ্টান বলিয়া মনে করেন এবং কোন্ অর্থে করেন না। তিনি যথার্থ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি নিজেকে 'হিন্দু' মনে করেন। তিনি সর্বপ্রকার সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেনঃ

আমরা যীশুর প্রকৃত বার্তাবহদের চাই। তাঁহারা দলে দলে হাজারে হাজারে ভারতে আসুন, যীশুর মহৎ জীবন আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরুন এবং আমাদের সমাজের গভীরে তাঁহার ভাব অনুস্যূত করিতে সহায়তা করুন। যীশুকে তাঁহারা ভারতের প্রত্যেক গ্রামে–প্রতি প্রান্তে প্রচার করুন।

যখন কোন ব্যক্তি মুখ্য বিষয়ে এতখানি নিশ্চয়, তখন তিনি আর যাহা বলুন না কেন, তাহা গৌণ বিষয়ের বিশদ উল্লেখমাত্র। যাঁহারা এতদিন যাবৎ গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যদেশে এবং ভারতের প্রবালাকীর্ণ সমুদ্রতটে আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আচার ও জীবন-নীতির ব্যাপারে একজন পৌত্তলিক ধর্মযাজকের এই উপদেশ-বর্ষণ এক দারুণ অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। অধিকাংশ সংশোধনের পক্ষে অবমাননা-বোধ অপরিহার্য। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তকের মহিমান্বিত জীবন-সম্পর্কে আলোচনার পর—সুদূর বিদেশী জাতিগুলির সম্মুখে যাঁহারা খ্রীষ্ট-জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেন বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছিল; এবং তাঁহার উপদেশ অনেকাংশে সেই নাজারেথবাসী যীশুখ্রীষ্টের উক্তির মতই শোনাইতেছিলঃ

‘তোমার অর্থপেটিকায় স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র সংগ্রহ করিও না, পরিধানের নিমিত্ত পোশাক ও জুতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না, এমন কি নিজের নিমিত্ত একখানি ভ্রমণ-যষ্টিও সংগ্রহ করিও না; কারণ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার আহার্য পাইবার অধিকারী।’

যাঁহারা বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতীচ্য-দেশীয়গণের সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে, এমন কি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ের মনোভাব—যাহাকে বিবেকানন্দ ‘দোকানদারি মনোবৃত্তি’ আখ্যা দিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রাচ্য-দেশীয়গণের ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

বিষয়টি ধর্মপ্রচারকদের পক্ষে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা পৌত্তলিক প্রাচ্য জগৎকে ধর্মান্তরিত করিতে চান, পার্থিব জগতের সাম্রাজ্য এবং বৈভবকে ঘৃণাসহকারে পরিহারপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজ-প্রচারিত ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।

ভ্রাতা বিবেকানন্দ নৈতিক দিক্ হইতে ভারতকে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলিয়া মনে করেন। পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের আধ্যাত্মিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ডেট্রয়েটে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা-সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণীর অংশবিশেষ এখানে প্রদত্ত হইলঃ

নিরহঙ্কার-ভাবই পুণ্য এবং সকল প্রকার অহং-ভাবই পাপ—এই মর্মে ভারতীয়দের যে-বিশ্বাস বর্তমান, এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার মূল নৈতিক সুরটি ধ্বনিত করেন। গত সন্ধায় বক্তৃতায় উক্ত ভাবেরই প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহাকেই তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম বলা যাইতে পারে।

হিন্দু বলেন, নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করা স্বার্থপরতার কাজ, সেই জন্য উহা ঈশ্বরের পূজা ও অতিথিসেবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। নিজের উদরপূর্তির জন্য আহার্য প্রস্তুত করা স্বার্থপরতার কাজ, সুতরাং দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য আহার্য প্রস্তুত করা হয়। ক্ষুধার্ত অতিথির আবেদন পূর্ণ করিবার পর হিন্দু স্বয়ং অন্নগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। এই মনোভাব দেশের সর্বত্র প্রকট। যে-কোন ব্যক্তি গৃহস্থের নিকট আসিয়া আহার ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারে এবং সকল গৃহের দ্বারই তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

জাতিভেদ-প্রথার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি তাহার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়—উত্তরাধিকারসূত্রে; সূত্রধর সূত্রধর-রূপেই জন্মগ্রহণ করে, স্বর্ণকার স্বর্ণকার-রূপেই, শ্রমিক শ্রমিক-রূপেই এবং পুরোহিত পুরোহিত-রূপেই।

দুই প্রকার দান বিশেষ প্রশংসার্হ, বিদ্যাদান আর প্রাণদান। বিদ্যাদানের স্থান সর্বাগ্রে। অপরের জীবন রক্ষা করা উত্তম কর্ম, বিদ্যাদান অধিকতর উত্তম কর্ম। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান পাপ, পণ্যের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে যিনি বিদ্যা বিক্রয় করেন, তিনি নিন্দার্হ। সরকার মধ্যে মধ্যে এই-সকল শিক্ষাদাতাকে সাহায্য প্রদান করেন এবং তাহার নৈতিক ফল তথাকথিত কোন কোন সুসভ্য দেশে যে-ব্যবস্থা বর্তমান, তাহা অপেক্ষা উত্তম।

বক্তা এ-দেশের সর্বত্র সভ্যতার সংজ্ঞা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ প্রশ্ন তিনি অন্যান্য দেশেও করিয়াছেন। অনেক সময় উত্তরের মর্ম হইতঃ আমরা যাহা, তাহাই সভ্যতা। তিনি উক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

তাঁহার মতেঃ কোন জাতি জলে স্থলে এমন কি সমস্ত পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে এবং জীবনের উপযোগিতা-বিষয়ক সমস্যাগুলির আপাত-সমাধান করিতে পারে, তথাপি সভ্যতা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব হইয়া উঠে না। যে আপন আত্মাকে জয় করিতে পারিয়াছে, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট। জগতে অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই এইরূপ অবস্থা অধিক দৃষ্ট হয়—কারণ সেখানে ঐহিক বিষয় গৌণ, আধ্যাত্মিকতার সহায়কমাত্র। ভারতীয়গণ প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত সকল বস্তুর মধ্যে আত্মার বিকাশ দর্শন করেন, এবং প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারা এই দৃষ্টিকোণ হইতেই অর্জন করেন। সুতরাং অদম্য ধৈর্যেরস হিত কঠিনতম দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার মত ধীর প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা ভারতে রহিয়াছে। সেইজন্য সেখানে এমন একটি জাতি আছে, যাহাদের নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারা দূরদূরান্তের চিন্তানায়কদের আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের স্কন্ধ হইতে পীড়াদায়ক সাংসারিক বোঝা লাঘব করিতে আহ্বান জানাইয়াছে।

এই বক্তৃতার মুখবন্ধে বলা হয় যে, বক্তাকে বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতেই দিলেন। এই তিনটিকে নির্বাচন করিবার কারণ ক্রমশঃ জানা যাইবে। এই তিনটি প্রশ্ন হইলঃ (১) ভারতবাসীরা কি তাহাদের সন্তানদের কুমিরের মুখে সমর্পণ করে? (২) তাহারা কি নিজেদের জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে নিক্ষেপ করে? (৩) তাহারা কি বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি সেই সুরেই দিলেন, যে-সুরে একজন আমেরিকাবাসী বিদেশে ভ্রমণকালে—নিউ ইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় কিনা, অথবা ইওরোপে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—এরূপ উপকথা-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর

দেন! স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উক্ত প্রথম প্রশ্নটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং উত্তর-দানের অযোগ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

যখন কতিপয় সদাশয় অথচ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন, 'কি কারণে কেবল বালিকাদেরই কুমিরের মুখে সমর্পণ করা হয়?'—তখন তিনি বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দেন, 'বোধ হয় তাহারা অধিকতর নরম ও কোমল বলিয়া, এবং সেই তমসাচ্ছন্ন দেশের জলাশয়সমূহের অধিবাসিগণ দন্তদ্বারা সহজেই তাহাদের চর্বণ করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ করা হয়।'

জগন্নাথ-সম্পর্কিত গল্প সম্বন্ধে বক্তা পবিত্র নগরের—পুরীর প্রাচীন রথযাত্রা-উৎসব বর্ণনা করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, সম্ভবতঃ রথের রজ্জু ধরিবার ও টানিবার আগ্রহাতিশয্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকামী ব্যক্তি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। এই ধরনের কিছু দুর্ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া এমন বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার কথা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন, এবং সত্য তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, হিন্দু বিধবাগণ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন স্বেচ্ছায়।

যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিতেছে, সেখানে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা, যাঁহারা সর্বকালে আত্মহত্যার বিরোধী, তাঁহারা বিধবাদের উক্ত কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন; এবং যে-সকল ক্ষেত্রে স্বাধ্বী বিধবাগণ লোকান্তরে স্বামীর সহগামী হইবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই অগ্নিপরিক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তাঁহারা হস্ত-দুইখানি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা পূরণে আর কোন বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ নয়, যেখানে নারী প্রেমবশতঃ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার অনুগমন করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল দেশেই কিছু নারী প্রাণবিসর্জন করিয়াছে। যে-কোন দেশেই এই ধরনের

আবেগ বিরল, এবং ভারতবর্ষেও ইহা অন্যান্য দেশের মতই নিত্যকার সাধারণ ব্যাপার নয়।

বক্তা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, ভারতবাসীরা নারীগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করেন না, এবং তাঁহারা কখনও 'ডাইনী' হত্যা করেন নাই।

বক্তার শেষোক্ত শ্লেষটি অতি তীব্র। এই হিন্দু সন্ন্যাসীর দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন এখানে নাই, শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ইহার সাধারণ ভিত্তি হইল– অনন্তের উপলব্ধির জন্য আত্মার যে-প্রয়াস তাহারই উপর। একজন পণ্ডিত হিন্দু এই বৎসর লাওয়েল ইনস্টিট্যুটের পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার যাহার সূচনা করিয়া- ছিলেন, ভ্রাতা বিবেকানন্দ যোগ্যতার সহিত তাহারই উপসংহার করিলেন।

এই নূতন পর্যটকের ব্যক্তিত্ব অধিকতর আকর্ষণীয়, যদিও হিন্দু দর্শনের মতানুয়ায়ী ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বিবেকানন্দকে কার্যসূচীর শেষের দিকে রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতাগণ তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তা দীর্ঘ নীরস বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, এবং শ্রোতাগণ দলে দলে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তখন সম্মেলনের সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন, সমাপ্তিসূচক স্বস্তিবাচনের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিবেন; তখনই শ্রোতারা শান্ত হইত। চার সহস্র নরনারী অসহ্য গরমে পাখা ব্যজন করিতে করিতে স্মিতমুখে ও সাগ্রহে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপর বক্তাদের বক্তৃতাকালে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সভাপতি সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুটিকে শেষে পরিবেশন করিবার পুরাতন রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

৯. হিন্দু ও খ্রীষ্টান

[১৮৯৪ খ্রীঃ, ২১ ফেব্রুআরী ডেট্রয়েটে প্রদত্ত ‘Hindus and Christians’ বক্তৃতার অনুবাদ।]

বিভিন্ন দর্শনের তুলনায় দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা। যদি ভারতে নতুন কোন ভাব আসে আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ করে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ—ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান্ এই অবতারেই প্রথম প্রচার করে গেছেন, ‘আমি ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের প্রেরয়িতা, আমি সকল ধর্মের উৎস।’ তাই আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে বড়ই পার্থক্য, এটি আমাদের কেউ কোন দিন শেখায়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হতে হবে। য়াহুদীদের মত বলিদান-প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের এই বলি বা উৎসর্গ-প্রথার সহজ অর্থঃ আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ ঈশ্বরকে নিবেদন না করাটা ভাল নয়। তাই আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; সহজে সংক্ষেপে এই হল ভাবটি। তবে য়াহুদীর ধারণা উৎসর্গীকৃত মেষটির উপর তার পাপরাশি চলে যাবে, আর সে পাপমুক্ত হবে। এই ‘সুন্দর’ ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশলাভ করেনি, তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ এসে আমাকে বলে, ‘আমার রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হও’, তাকে বলব, ‘ভাই, চলে যাও, বরং আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।’ ঐ ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেনঃ যখনই পৃথিবীতে অসদ্‌ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের

সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই কাজ করে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই দেখবে অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেন—তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও বলি না, আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র রাস্তা। যে-কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে—তার প্রমাণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিত্র সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্র সদ্ভাভাবাপন্ন নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'অসংখ্য নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতে ছোট ছেলেদের প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ। যারা প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের পক্ষে ধর্মের বিভিন্নতা নিয়ে মারামারি করা একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দার্শনিকদের কথা, এঁদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ করে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তার কারণ—তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

ঐ যে মানুষটি মূর্তির সামনে প্রণাম করছে, ও কিন্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মত নয়। এ হিন্দুর এক বিশষত্ব। মূর্তির সামনে মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'সোঽহম্, তিনিই আমার স্বরূপ; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সোঽহম্, সোঽহম্; আমি কোন পুস্তকের বাঁধনে বাঁধা পড়িনি! কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই! আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোঽহম্, সোঽহম্।' বার বার এই কথা উচ্চারণ করে সে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, বড় হতভাগ্য আমি।'

বই-পড়া জ্ঞানের ওপর ধর্ম নির্ভর করে না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বল—আত্মাকে আত্মা-

রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পার, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূপে চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বর-তত্ত্ব যতই শোন না কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, আরও বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হতে পার—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 'ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মাকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে পার?' তা হলে সকল সংশয়ের শেষ, তা হলেই মনের সব বাঁকাচোরা সোজা হয়ে যাবে। জীবাত্মা (মানুষ) যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সম্মুখীন হয়, তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বিচারে কোন ব্যক্তি অদ্ভুত বিদ্বান্ হতে পারেন, তবু তিনি হয়তো ধর্ম বিষয়ে 'অ, আ, ক, খ' না জানতে পারেন। আমি তাঁকে তাই বলব। জিজ্ঞাসা করব, 'আপনি কি আত্মাকে আত্মা বলে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি জড়ের ঊর্ধ্বে নিজ আত্মাকে বিকশিত করেছেন?' যদি তা না করে থাকেন, তা হলে তাঁকে বলব, 'আপনার ধর্ম লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, শুধু বৃথা গর্ব!'

আর ঐ 'হতভাগ্য' হিন্দুটি মূর্তির সামনে বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা করে শেষে বলে, 'হে ঈশ্বর, পারলাম না তোমায় আত্মস্বরূপে ধারণা করতে, অতএব এই সাকার মূর্তিতেই তোমায় চিন্তা করি।' তখন সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম করে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে আবার বলে, 'হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা কর, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্য।'

তোমরা কেবল শুনে আসছ, হিন্দুরা পাথর পূজা করে। তাদের অন্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমরা কি ভাব? এই দেখ, আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যে সমুদ্র পেরিয়ে এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। এসে অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের ঐ-সব কথা। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হতে পারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিষ ওরা তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু!' এই হল তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটি কথা তোমাদের বলব, কোন নিষ্ঠুর সমালোচনা করছি না। তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কি কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে বলে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি!' তারা কিন্তু মুসলমানদের একটিও কথা বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়া পড়বে! হিন্দু বড় নিরীহ, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় বলে যায়, 'মূর্খেরা যা বলবার বলুক।' এই হল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করে তোল, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চীৎকার কর, 'সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা আমেরিকান। আমরা দুনিয়া সুদ্ধ লোকের সমালোচনা করব, গাল দেব, শাপ দেব, যা খুশি বলব, কিন্তু আমাদের ছুঁয়ো না, আমরা বড় স্পর্শকাতর—লজ্জাবতী লতা।'

তোমরা যা খুশি করতে পার; আমরাও যে-ভাবে আছি সে-ভাবেই সন্তুষ্ট আছি। একটা বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য গেলাই না যে—পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু মানুষই খারাপ! তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা যখন আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন মনে রাখে—সমস্ত ভারতবাসী যদি দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারতসমুদ্রের তলায় যত মাটি আছে, সব যদি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করে থাক, তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্যে? আমরা কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি—কাউকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা বলে থাক—তোমাদের ধর্ম প্রসারশীল, তোমরা আক্রমণধর্মী। কিন্তু কত জনকে নিতে পেরেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ চীনা, তারা বৌদ্ধ; তারপর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা, শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখ—এই যে খ্রীষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা হয়েছিল?

এক ফোঁটা রক্তপাত না করে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বল তো—তলোয়ার ছাড়া খ্রীষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস মন্থন করে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি—তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর-গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো! যতই গর্ব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কী ভাল করতে পার? 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ!' কেন? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন! রোমানরাও ঐ কথা বলত, কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।'২ আর ঐ-সব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির ওপর নির্মিত। বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। এ জিনিষ মরবেই।

ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচতে চাও, যদি চাও তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি শোন—খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খ্রীষ্টান নও; জাতি-হিসাবে তোমরা খ্রীষ্টান নও। ফিরে চল খ্রীষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না, 'পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।'৩ তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব! উলটে ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি, সব কপটতা। যদি এই জাতি বাঁচতে চায়, তবে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'ঈশ্বর এবং ধন-দেবতা (ম্যামন)-কে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না।'৪ এই-সব সম্পদ্—সব খ্রীষ্ট থেকে? খ্রীষ্ট এ-সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে সম্পদ্-উন্নতি আসে, তা অনিত্য—ক্ষণস্থায়ী! প্রকৃত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পার এই দুটি—এই সম্পদের সঙ্গে খ্রীষ্টের আদর্শ—মেলাতে, তবে খুবই ভাল।

যদি না পার, তবে বরং সম্পদ্ ছেড়ে দাও, খ্রীষ্টের কাছেই ফিরে চল। খ্রীষ্টশূন্য প্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্যে প্রস্তুত হও।

১০. ভারতে খ্রীষ্টধর্ম

[১৮৯৪ খ্রীঃ, ১১ মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণী—'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস'-এ প্রকাশিতঃ গতরাত্রে ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বিবেকানন্দ এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন এবং অপূর্ব বাগ্মিতাপূর্ণ এক ভাষণ দিয়েছেন। পুরা আড়াই ঘণ্টা তিনি বলেন।]

জাপান ও চীন মিশনারীদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এই দেশের লোকেরা মনে করে, ভারতবর্ষ একটা বিরাট পতিত ভূখণ্ড, সেখানে আছে অনেক জঙ্গল আর কয়েকটি সভ্য ইংরেজ।

ভারতবর্ষ আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক এবং লোকসংখ্যা ত্রিশ কোটি। সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক গল্প বলা হয়, এবং সে-গুলি অস্বীকার করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খ্রীষ্টানরা যখন কোন নূতন দেশে গিয়েছে, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের যেমন নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যগণ ভারতের আদি অধিবাসীদের সেরূপ নির্মূল করার চেষ্টা করেননি; বরং তাঁদের প্রয়াস ছিল কি করে পশুপ্রকৃতি মানুষদের উন্নত করা যায়।

স্পেন-দেশের লোকেরা সিংহলে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে। তারা ভেবেছিল—পৌত্তলিকদের নিধন করে তাদের মন্দির ভেঙে ফেলার জন্য ঈশ্বর তাদের আদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধদের কাছে তাদের ধর্মগুরুর এক ফুট লম্বা একটি দাঁত ছিল, স্পেনের লোকেরা সেটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে এবং মাত্র কয়েক কুড়ি লোককে ধর্মান্তরিত করে।

পোর্তুগীজেরা এসেছিল পশ্চিম ভারতে। হিন্দুরা ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাসী এবং সেই পবিত্র বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে তারা একটি মন্দির গড়েছিল। আক্রমণকারীরা মন্দিরটি দেখে বললে, 'এ শয়তানের সৃষ্টি', সুতরাং এই অপূর্ব কীর্তিটি বিনাশ করার জন্য তারা একটি কামান নিয়ে এসে মন্দিরের একটা অংশ ধ্বংস করল। ক্রুদ্ধ জনসাধারণ তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিল।

প্রথম দিকে মিশনারীরা দেশ অধিকার করার চেষ্টা করেছে, এবং বলপ্রয়োগে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টায় বহু লোককে হত্যা করেছে এবং কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবন-রক্ষার জন্য খ্রীষ্টান হয়েছে। পোর্তুগীজদের তরবারির ভয়ে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই বাধ্য হয়েছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে, এবং তারা বলত, 'আমরা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলতে বাধ্য হয়েছি।' ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মও শীঘ্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের এক অংশ অধিকার করে বসল; সুযোগের সদ্ব্যবহারের অভিপ্রায়ে তারা মিশনারীদের দূরেই রেখেছিল। হিন্দুরাই প্রথম মিশনারীদের স্বাগত জানায়, ব্যবসায়ে ব্যস্ত ইংরেজরা নয়। পরবর্তী কালের প্রথম মিশনারীদের কয়েক জনের প্রতি খুব শ্রদ্ধা আছে। তাঁরা ছিলেন যীশুর যথার্থ সেবক; তাঁরা ভারতবাসীদের নিন্দা করেননি বা তাদের সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যা কথা রটাননি। তাঁরা ছিলেন ভদ্র ও সহৃদয়। ইংরেজরা যখন ভারতের প্রভু হয়ে বসল, তখন থেকেই মিশনারীদের উদ্যম নিস্তেজ হতে আরম্ভ করে—এই অবস্থাই ভারতে মিশনারীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিকের একজন মিশনারী ডক্টর লঙ্ এই দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নীল-উৎপাদনকারীদের দ্বারা ভারতে যে-অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বর্ণনা-সম্বলিত একটি ভারতীয় নাটকের তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল কি? ইংরেজরা তাঁকে জেলে পুরেছিল। এ-সব মিশনারীদের দেশের মঙ্গল সাধন করেছেন, কিন্তু তাঁদের যুগ কেটে গেছে। সুয়েজ খাল বহু অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

এখনকার মিশনারীরা বিবাহিত এবং বিবাহিত বলেই তাদের কাজ ব্যাহত হয়। জনসাধারণ সম্বন্ধে মিশনারী কিছুই জানে না, তাদের ভাষায় কথা কইতে পারে না, সেইজন্য তাকে বাস করতে হয় একটি ছোটখাটো শ্বেতকায় কলোনিতে। বিবাহিত বলেই এরূপ করতে সে বাধ্য হয়। বিবাহিত না হলে সে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস করতে পারত এবং প্রযোজন হলে মাটিতে শুতেও পারত। সুতরাং ভারতে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গী খোঁজবার জন্যে ইংরেজী-ভাষাভাষীদের মধ্যেই সে বাস করে। মিশনারী-প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। অধিকাংশ মিশনারীই তাদের কাজের অযোগ্য। আমি একজনও মিশনারী দেখিনি, যে সংস্কৃত জানে। কোন দেশের মানুষ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশের লোকেদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে কি করে? আমি কারও ওপর দোষারোপ করছি না, তবে এ-কথা সত্য যে, খ্রীষ্টানরা এমন লোকদের মিশনারী করে পাঠায়, যাদের মোটেই যোগ্যতা নেই। এটা দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত সন্তোষজনক ফল কিছুই হচ্ছে না, অথচ কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে।

মুষ্টিমেয় যারা ধর্মান্তরিত হয়, তারা মিশনারীদের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করে। যে-সকল ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে চাকরিতে বহাল রাখা হয় না, তারা আবার খ্রীষ্টধর্মও ত্যাগ করে। সংক্ষেপে সমগ্র ব্যাপারটা হল এই। ধর্মান্তরিত করার রকমটাও একেবারে হাস্যোদ্দীপক। মিশনারীদের আনীত টাকা তারা গ্রহণ করে। শিক্ষার দিক্‌টা বিবেচনা করলে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি সন্তোষজনক; কিন্তু ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দুরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি; তারা বঁড়শিতে ধরা না দিয়ে টোপটা খেয়ে নেয়! তাদের আশ্চর্য সহনশীলতা! একদা কোন মিশনারী বলেছিল, 'গোটা ব্যাপারটা সবচেয়ে বড় অসুবিধে ঐখানেই; আত্মসন্তুষ্ট লোকেদের কখনও ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়।'

আর মহিলা মিশনারীরা কোন কোন বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের বাইবেল সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেন এবং কি করে বুনতে হয়—তাও শেখান; এজন্যে তাঁরা মাসে চার শিলিং করে পান।

ভারতের মেয়েরা কখনও ধর্মান্তরিত হবে না। স্বদেশের নাস্তিকতা ও সংশয়বাদই মিশনারীদের অন্য দেশে যেতে প্ররোচিত করেছে। এদেশে এসে আমি বহু উদার প্রকৃতির পুরুষ ও নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ধর্মমহাসভার পর এক বিখ্যাত প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র একটি তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা দ্বারা আমাকে সংবর্ধনা করেছিল। সম্পাদক এটাকে বলেন—'উৎসাহ'। মিশনারীরা জাতীয়তাকে বিসর্জন দেয় না বা দিতে পারে না, তারা মোটেই উদার নয়; অতএব ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে তাদের দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না; অবশ্য নিজেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশায় তাদের সময় বেশ ভালই কাটে। ভারতের প্রয়োজন খ্রীষ্টের কাছ থেকে সাহায্য, খ্রীষ্ট-বিরোধীর কাছ থেকে নয়; এ-সকল মিশনারী খ্রীষ্টের মত নয়। খ্রীষ্টের আদর্শ অনুযায়ী তারা আচরণ করে না; তারা বিবাহিত, ভারতে গিয়ে তারা আরামের ঘর বাঁধে এবং সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা ভারতে এসে প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, যেমন বহু হিন্দু সাধক করে থাকেন, কিন্তু এ-সব মিশনারীর সেই চারিত্রিক পবিত্রতা নেই। হিন্দুরা সানন্দে খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টকে স্বাগত জানাবে, কারণ তাঁর জীবন ছিল পবিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু তারা অজ্ঞ, মিথ্যাচারী ও আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তিদের অনুদার উক্তিগুলি গ্রহণ করতে পারে না বা করবে না।

প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষ থেকে পৃথক্। এই পার্থক্য না থাকলে মানুষের মনের অধঃপতন হত। বিভিন্ন ধর্ম না থাকলে একটি ধর্মও টিকে থাকত না। খ্রীষ্টানের প্রয়োজন তার নিজের ধর্মের, হিন্দুরও তেমনি প্রয়োজন নিজ ধর্মের। বৎসরের পর বৎসর 'ধর্মগুলি' পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে। যে-সকল ধর্ম গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-গুলি আজও বেঁচে আছে। খ্রীষ্টানরা য়াহুদীদের ধর্মান্তরিত করতে পারল না কেন? কেনই বা তারা পারসীকদের খ্রীষ্টান করতে পারল না? মুসলমানদের তারা ধর্মান্তরিত করতে পারেনি কেন? চীন ও জাপানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি কেন? বৌদ্ধ ধর্মই প্রথম প্রচারশীল ধর্ম এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা যে-কোন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যার দ্বিগুণ। তারা তরবারির সাহায্যে প্রচার করেনি। মুসলমানেরা সবচেয়ে বেশী হিংসার পথ অবলম্বন

করেছে। তিনটি বৃহৎ প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। মুসলমানদেরও একসময় প্রতিপত্তির দিন এসেছিল।

প্রতিদিনই শোনা যায়—খ্রীষ্টান-জাতি রক্তপাতের দ্বারা দেশ অধিকার করছে। কোন মিশনারী এর প্রতিবাদে একটা কথা বলেছে? অতি রক্তপিপাসু জাতিগুলি কেন এমন একটি অভিযুক্ত ধর্মের প্রসংশা করবে, যে ধর্ম খ্রীষ্টের ধর্মই নয়? য়াহুদী ও আরবেরাই ছিল খ্রীষ্টধর্মের জন্মদাতা; খ্রীষ্টানেরা তাদের কিভাবেই না নির্যাতন করেছে! ভারতে খ্রীষ্টানদের যাচাই করা হয়ে গেছে এবং ওজনে তারা কম পড়েছে। আমি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে চাই না, অপরে তাদের কি চোখে দেখে, খ্রীষ্টানদের তাই দেখাতে চাই। যে-সকল মিশনারী নরকের আগুনের কথা প্রচার করে, সকলে তাদের ভয়ের চোখে দেখে। তরবারি ঘুরিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত মুসলমানেরা ভারতে এসেছে, কিন্তু আজ তারা কোথায়?

সকল ধর্মের উপলব্ধির শেষ সীমা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি। কোন ধর্মই তার বেশী শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই সার সত্য আছে এবং এই অমূল্য সম্পদের একটি বাহ্য আধার আছে। য়াহুদীর ধর্মগ্রন্থে বা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে শুধু বিশ্বাস করাটা গৌণ ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির পরিবর্তন ঘটে, আধার পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু মূল সত্য একই থেকে যায়। মূল সত্যগুলি অভিন্ন হওয়ার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেগুলিই ধরে থাকেন। যদি একজন খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তার ধর্মের মূল সত্য কি, তা হলে সে উত্তর দেবে, 'প্রভু যীশুর উপদেশ।' বাকী অধিকাংশই বাজে। তবে অসার অংশটিও নিরর্থক নয়; এর দ্বারাই আধার নির্মিত হয়। ঝিনুকের খোলটি আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু এর ভিতরেই থাকে মুক্তা। হিন্দু কখনও যীশুর জীবন-চরিত্র আক্রমণ করে কিছু বলবে না; যীশুর 'শৈলোপদেশ' সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ক-জন খ্রীষ্টান হিন্দু-ঋষিদের উপদেশের কথা জানে বা শুনেছে? তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত ছিল। এই হল প্রকৃতির নিয়ম। ধর্মজগতের এই মহান্ ঐকতান থেকে একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র কেন

গ্রহণ কর? এই অপূর্ব ঐকতান চলতে থাকুক। পবিত্র হও। কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য কর। কুসংস্কারই ধর্মের ওপর আধিপত্য করে। সকল ধর্মই ভাল, কারণ মূল সত্য সর্বত্র এক। প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে হবে। কিন্তু এই ব্যষ্টিগুলি নিয়েই গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি। এই চমৎকার পরিবেশ এখনই রয়েছে; এই অপূর্ব সৌধ নির্মাণের জন্য প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই কিছু না কিছু দেবার আছে।

যীশুখ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য যে-হিন্দু দেখতে পায় না, তাকে আমি করুণার পাত্র বলে মনে করি। খ্রীষ্টসদৃশ হিন্দু ঋষিকে যে-খ্রীষ্টান শ্রদ্ধা করে না, তাকেও আমি করুণা করি। মানুষ যত বেশী নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়, প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টি তার তত কমে যায়। যারা অপরকে ধর্মান্তরিত করে বেড়ায় এবং অপরের আত্মাকে পরিত্রাণ করার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত, তারা বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায়। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ভারতীয় নারীরা আরও উন্নত নয় কেন?' বিভিন্ন যুগে বর্বর আক্রমণকারীরাই অনেক পরিমাণে এর জন্যে দায়ী এবং ভারতবাসী নিজেরাও আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী। এ দেশের বল্‌নাচ ও উপন্যাসের ভক্ত মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বরাবরই অনেক ভাল। যে-দেশে নিজের সভ্যতা সম্বন্ধে এত দম্ভ, সেই দেশে আধ্যাত্মিকতা কোথায়? আমি তো দেখতে পাই না। 'ইহকাল' এবং 'পরকাল'—এই কথাগুলি তো শিশুদের ভয় দেখানোর জন্যে। এইখানেই সব-কিছু। ঈশ্বর নিয়ে জীবন যাপন, তাঁর ভাব নিয়েই বিচরণ—এইখানে এই শরীরেই! সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে; সমস্ত কুসংস্কার দূর করে দিতে হবে। ভারতে এখনও এ-রকম মানুষ আছে। এদেশে সে-রকম মানুষ কোথায়? আপনাদের প্রচারকেরা 'স্বপ্নবিলাসী'দের সমালোচনা করে; এখানে আরও কিছু বেশী 'স্বপ্নবিলাসী' থাকলে এদেশের মানুষ সমৃদ্ধশালী হতে পারত। এখানে যদি কেউ যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ আক্ষরিকভাবে পালন করে, তবে তাকে ধর্মোন্মত্ত বলা হবে। স্বপ্নবিলাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দাম্ভিকতা—এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। গুণগ্রাহী মধুমক্ষিকা ফুলের সন্ধান করে; হৃদয়-পদ্ম বিকশিত কর। সমগ্র জগৎ ঈশ্বরভাবে পূর্ণ, পাপে পূর্ণ নয়। আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করি। আমরা যেন

পরস্পরকে ভালবাসি। বৌদ্ধদের একটি সুন্দর প্রার্থনাঃ সকল সাধু-সন্তকে প্রণাম, সকল মহাপুরুষকে প্রণাম; জগতের সকল পবিত্র নরনারীকে প্রণাম!

১১. ভারতে শিক্ষাচর্চা

[সান ফ্রানসিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন—এই মর্মে শ্রোতাদের সমক্ষে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু অংশঃ]

বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথমে শাসন-যন্ত্র সব সময়েই পুরোহিতগণের অধিকারে ছিল। সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারেরও উৎস ছিল পুরোহিতশ্রেণী। অতঃপর পুরোহিতগণের নিকট হইতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া ক্ষত্রিয় অথবা রাজশক্তির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সামরিক শাসন প্রাধান্য লাভ করে। সর্বদাই এইরূপ ঘটিয়াছে। পরিশেষে ভোগবিলাসের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ অধঃপতিত হয় এবং অধিকতর শক্তিশালী ও বর্বর জাতির অধীন হইয়া যায়।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ইতিহাসের আদিকাল হইতে ভারতবর্ষ 'জ্ঞানের দেশ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও অন্য জাতিকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে অভিযানে বাহির হয় নাই। এই দেশের অধিবাসিগণ কোনদিনই যোদ্ধা নয়। আপনাদের—পাশ্চাত্যদের মত তাহারা কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, কারণ মাংসই যোদ্ধা সৃষ্টি করে; প্রাণীর রক্ত আপনাদের চঞ্চল করিয়া তোলে এবং আপনারা কিছু একটা করিবার ইচ্ছা করেন।

এলিজাবেথের সময়কার ইংলণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা করুন। আপনাদের জাতির পক্ষে সেটি কি অন্ধকার-যুগই ছিল, আর আমরা তখনও জ্ঞানে কত উন্নত ছিলাম! অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির কলাবিদ্যাচর্চার যোগ্যতা এ পর্যন্ত খুবই কম। তাহাদের উত্তম

কাব্য আছে—দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, শেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি অপূর্ব! শুধু ছন্দের মিল ঘটানোই কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়।

ভারতবর্ষে বহুগুণ পূর্বে সঙ্গীত পূর্ণ সপ্ত-সুরে, এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ সুরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প—এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতে সব কিছু নির্ভর করে।

১২. ভারতের নারী

[১৯০০ খ্রীঃ, ১৮ জানুআরী ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় শেক্সপীয়র ক্লাব হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা।]

স্বামী বিবেকানন্দঃ কেহ কেহ আমার বক্তৃতার পূর্বে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, আবার কেহ কেহ বক্তৃতার পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশ্ন করিতে চান। কিন্তু আমার প্রধান অসুবিধা এই যে, আমি জানি না—আজ আমাকে কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে। তবে হিন্দুদর্শন, হিন্দুজাতি, হিন্দুদের ইতিহাস বা সাহিত্য-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে ভাষণ দিতে আমি প্রস্তুত। মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা কোন একটি বিষয় প্রস্তাব করিলে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

প্রশ্নঃ স্বামীজী, আমেরিকাবাসীরা অত্যন্ত প্রয়োগকুশল জাতি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুদর্শনের কোন্ বিশেষ নীতি বা মতবাদটি আমরা জীবনে কাজে লাগাইব, আর খ্রীষ্টধর্ম আমাদের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঐ নীতি আর কতটুকু বেশী কী করিবে?

স্বামীজীঃ ইহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। ইহা আপনাদের উপর নির্ভর করে। হিন্দুদর্শনের ভিতর গ্রহণযোগ্য এবং জীবনগঠনের সহায়ক কিছু যদি পান, তবে তাহা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। আপনারা দেখিতেছেন, আমি মিশনারী নই এবং কাহাকেও আমার ভাবানুযায়ী মত পরিবর্তন করিতে বলি না। আমার নীতি এই—সব ভাবই ভাল এবং মহান্। আপনাদের কোন কোন ভাব ভারতবর্ষের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে, আবার আমাদের কতকগুলি ভাব এই দেশের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে; সুতরাং ভাবগুলি সারা পৃথিবীতে অবশ্যই ছড়াইতে হইবে।

প্রশ্নঃ আপনাদের দর্শনের ফলাফল আমরা জানিতে চাই। আপনাদের ধর্ম ও দর্শন কি আপনাদের নারীজাতিকে আমাদের নারীজাতি অপেক্ষা উন্নততর করিয়াছে?

স্বামীজীঃ ইহা বড়ই ঈর্ষাসূচক প্রশ্ন। আমি আমাদের মেয়েদের ভাল মনে করি এবং এদেশের মেয়েদেরও ভাল মনে করি।

প্রশ্নঃ বেশ তো, আপনি কি আপনার দেশের মেয়েদের কথা—তাহাদের রীতিনীতি, শিক্ষা এবং পরিবারে তাহাদের স্থান সম্বন্ধে বলিবেন?

স্বামীজীঃ নিশ্চয়ই, এগুলি সম্বন্ধে আমি খুব আনন্দের সহিত বলিব। তাহা হইলে আজ আপনারা 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধেই জানিতে ইচ্ছুক, দর্শন বা অন্য বিষয় নয়, ঠিক তো?

১৩. বক্তৃতা

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, আমার অনেক কিছু অপূর্ণতা আপনাদের সহ্য করিতে হইবে, কারণ আমি এমন এক সাধকসম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা বিবাহ করে না। অতএব নারীর সহিত মাতা, জায়া, কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কে অপরের জ্ঞান যতটা পূর্ণ, আমার ততটা না হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ একটি বিশাল মহাদেশ—কেবল একটি দেশ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির তুলনায় ইওরোপের জাতিগুলি পরস্পরের নিকটতর এবং অধিকতর সাদৃশ্য-বিশিষ্ট। আপনারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন, যদি বলি যে, সমগ্র ভারতবর্ষে আটটি বিভিন্ন ভাষা আছে। ঐগুলি বিভিন্ন ভাষা—আঞ্চলিক ভাষামাত্র নয় এবং প্রত্যেকেরই স্বকীয় সাহিত্য আছে। এক হিন্দীই দশ কোটি লোকের ভাষা, বাঙলা প্রায় ছয় কোটি লোকের, ইত্যাদি।

যে-কোন দুইটি ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে যতটা প্রভেদ, তাহা অপেক্ষা চারিটি উত্তর-ভারতীয় ভাষা ও দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষারগুলির মধ্যে প্রভেদ অধিকতর। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আপনাদের ভাষা ও জাপানী ভাষার মধ্যে যতখানি পার্থক্য, এইগুলির মধ্যেও ততখানি পার্থক্য। আপনারা জানিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, যখন আমি দক্ষিণ-ভারতে যাই, সেখানে সংস্কৃত বলিতে পারে—এমন লোকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ইংরেজীতেই কথা বলিতে হয়।

অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার, রীতি, আহার, পরিচ্ছদ এবং চিন্তাধারাতেও অনেক পার্থক্য আছে। ইহার উপর আবার বর্ণভেদ আছে। প্রত্যেকটি বর্ণ যেন একটি স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ। যদি কেহ ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করে, তবেই সে একজনের চালচলন দেখিয়া বলিতে পারিবে, লোকটি কোন্ বর্ণভুক্ত। আবার বর্ণগুলির ভিতরও বিভিন্ন আচরণ ও প্রথা বিদ্যমান। বর্ণগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, মিশুক নয়; অর্থাৎ এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত সামাজিকভাবে মিলিবে, কিন্তু একত্র পানাহার করিবে না বা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ

হইবে না। এই-সব ব্যাপারে তাহারা স্বতন্ত্র। পরস্পরের সহিত আলাপ এবং বন্ধুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এই পর্যন্তই।

ধর্মপ্রচারক বলিয়া অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা সাধারণভাবে ভারতীয় নারীকে জানিবার সুযোগ আমাদেরই বেশী। ধর্মপ্রচারককে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়, ফলে সমাজের সকল স্তরের সহিত তাঁহার সংযোগ। উত্তর-ভারতেও মহিলারা পুরুষদের সম্মুখে বাহির হন না, সেখানেও ধর্মের জন্য তাঁহারা বহুক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গ করেন এবং আমাদের প্রবচন শুনিতে ও আমাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতে কাছে আসেন। ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে আমি সব কিছুই জানি—এরূপ বলা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং আমি আপনাদের সম্মুখে আদর্শটি উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রত্যেক জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর ভিতরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আদর্শের রূপায়ণ ঘটে। ব্যষ্টি একটি আদর্শের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। জাতি এই-সব ব্যষ্টির সমষ্টিমাত্র, এবং জাতিও একটি মহান্ আদর্শের প্রতীক। ঐ আদর্শের উদ্দেশ্যেই জাতি অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ইহা যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে যে, একটি জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথমে ঐ জাতির আদর্শকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব মাপকাঠি আছে এবং সেইটি ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা উহার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সর্বপ্রকার উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ কিংবা অবনতি—সবই আপেক্ষিক। ইহা কোন একটি মান নির্দেশ করে; কোন মানুষকে বুঝিতে হইলে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে তাহার স্বকীয় মানের পরিপেক্ষিতে তাহাকে বুঝিতে হইবে। জাতিগত জীবনে এইটি স্পষ্টতরভাবে দেখিতে পাইবেন। এক জাতি যাহা ভাল বলিয়া মনে করে, অন্য জাতি তাহা ভাল নাও বলিতে পারে। আপনাদের দেশে জ্ঞাতি-ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ খুবই সঙ্গত, কিন্তু ভারতে ঐরূপ বিবাহ আইন-বিরুদ্ধ; শুধু তাই নয়, উহাকে অতি ভয়ানক নিষিদ্ধ যৌন-সংসর্গ মনে করা হয়। এ দেশে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ভারতে উচ্চবর্ণের নারীর দুইবার বিবাহ চরম মর্যাদাহানিকর। অতএব দেখিতেছেন, আমরা এত বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া কাজ করি যে, একটি জাতিকে অপর জাতির মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করা উচিত হইবে না, ইহা

সম্ভবও নয়। অতএব একটি জাতি কোন্ আদর্শকে তাহার সামনে রাখিয়াছে, তাহা জানা আমাদের কর্তব্য। বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা একটা ধারণা করিয়া বসি যে, সকল জাতির নৈতিক নিয়মাবলী ও আদর্শ এক। যখন অপরকে বিচার করিতে যাই, তখন ধরিয়া লই যে, আমরা যাহা ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা সকলের পক্ষেই ভাল হইবে। আমরা যাহা করি, তাহাই উচিত কর্ম; আমরা যাহা করি না, অপরে তাহা করিলে ঘোর নীতিবিরুদ্ধ হইবে। সমালোচনার উদ্দেশ্যে আমি এ-কথা বলিতেছি না, কেবল সত্যকে আপনাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছি। যখন শুনি পদতলে সঙ্কুচিত করার জন্য পাশ্চাত্য নারীগণ চীনা মেয়েদের ধিক্কার দেয়, তখন তাহারা চিন্তা করে না তাহাদের আঁটসাঁট কাঁচুলি ব্যবহার জাতির অধিকতর ক্ষতি করিতেছে। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। আপনারা অবশ্যই জানেন, কর্সেট ব্যবহারে শরীরের যতটা ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, পদতল সঙ্কুচিত করায় তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিও হয় না। কারণ প্রথমোক্ত উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ স্থানচ্যুত হয় এবং মেরুদণ্ডটি সাপের মত বাঁকিয়া যায়। যদি মাপ নেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বক্রতা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। দোষ দেখাইবার জন্য নয়, শুধু অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য বলিতেছি। আপনারা অন্য দেশের নারীদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাহারা আপনাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে না বলিয়া তাহাদের ব্যবহারে আপনারা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হন। ঠিক একই কারণে অন্যান্য জাতির নারীগণও আপনাদের কথা ভাবিয়া শিহরিত হয়।

সুতরাং দুই পক্ষের ভিতরই একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। একটা সাধারণ মিলনভূমি, একটা সর্বজনীন বোধের ক্ষেত্র ও একটা সাধারণ মানবতা আছে, যাহা আমাদের কর্মের ভিত্তি হইবে। আমাদের সেই পূর্ণ ও নির্দোষ মানবপ্রকৃতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা এখন শুধু আংশিকভাবে এখানে ওখানে কাজ করিতেছে। পূর্ণত্বের চরম বিকাশ একটি মানুষে সম্ভব নয়। আপনি একটি অংশকে রূপ দিন, আমিও আমার সাধ্যমত সামান্যভাবে আর একটি অংশ রূপায়িত করি। এখানে একজন একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে, অন্যত্র আর একজন আর একটি অংশ গ্রহণ করে। পূর্ণত্ব হইল এই সমস্ত অংশের সমষ্টিরূপ। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই একটি

ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়; প্রত্যেক জাতিকে মানব স্বাভাবের একটি দিক্ বিকশিত করিতে হয়; এবং আমাদিগকে এই সমস্তই একসঙ্গে গ্রথিত করিতে হইবে। সম্ভবতঃ সুদূর ভবিষ্যতে এমন এক জাতির উদ্ভব হইবে, যে-জাতির ভিতর বিভিন্ন জাতিদ্বারা অর্জিত বিস্ময়কর উৎকর্ষগুলি প্রকাশিত হইবে এবং উহা আর একটি নূতন জাতিরূপে দেখা দিবে। এই জাতির মত একটি জাতির কথা মানুষ এখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। এইটুকু বলা ছাড়া কাহারও সমালোচনা করিয়া আমার বলিবার কিছু নাই। জীবনে ভ্রমণ বড় কম করি নাই। সর্বদা চক্ষু খুলিয়া রাখিয়াছি এবং যতই আমি ঘুরি, ততই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সমালোচনা করিতে আর পারি না।

এখন 'ভারতীয় নারী'র প্রসঙ্গ। ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই ইহার প্রথম ও শেষ কথা। 'নারী'-শব্দ হিন্দুর মনে মাতৃত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। আমাদের শৈশবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে একপাত্র জল লইয়া মায়ের কাছে রাখিতে হয়। তিনি তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উহাতে ডুবাইয়া দেন এবং আমরা ঐ জল পান করি।

পাশ্চাত্যে নারী জায়া। সেখানে জায়ারূপেই নারীত্বের ভাবটি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে—নারীত্বের সমগ্র শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্যে স্ত্রীই গৃহকর্ত্রী, ভারতীয় গৃহে কর্ত্রী—জননী। পাশ্চাত্যে গৃহে যদি মা আসেন, তবে তাঁহাকে (ছেলের) স্ত্রীর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; ঘরকরনা স্ত্রীর। মা সর্বদা আমাদের গৃহেই বাস করেন; স্ত্রীকে তাঁহার অধীনে থাকিতেই হইবে। ভাবের এই-সব প্রভেদ আপনারা লক্ষ্য করুন।

আমি কেবল তুলনার প্রস্তাব করিতেছি। প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে আমরা দুই দিকের তুলনা করিতে পারি। এই তুলনাটি করুনঃ যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, 'স্ত্রী-রূপে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায়?' এই প্রশ্নে ভারতবাসী প্রতিপ্রশ্ন করিবে, 'জননী-রূপে মার্কিন মহিলার মার্যাদা কি?' সেই সর্বমহিমময়ী, যিনি আমায় এই শরীর দিয়াছেন তিনি কোথায়? নয় মাস যিনি আমাকে তাঁর শরীরে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়? কোথায়

তিনি, যিনি আমার প্রয়োজন হইলে বার বার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যাঁহার স্নেহ অফুরন্ত—তা আমি যতই দুষ্ট ও হীনপ্রকৃতি হই না কেন? কোথায় সেই জননী—আর কোথায় স্ত্রী, যে নারী স্বামীর দ্বারা সামান্য অবহেলিত হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় লয়? অহো মার্কিন মহিলাবৃন্দ, আপনাদের ভিতর কোথায় সেই জননী? আপনাদের দেশে তাঁহাকে আমি খুঁজিয়া পাই না। আপনাদের দেশে আমি এমন পুত্র দেখি নাই, যাহার কাছে জননীর স্থান সর্বপ্রথম। যখন আমরা দেহত্যাগ করি, তখনও আমরা চাই না যে, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আমাদের জননীর স্থান গ্রহণ করে। ধন্য আমাদের জননী! যদি মায়ের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আবার মায়ের কোলেই মাথা রাখিয়া আমরা মরিতে চাই। কোথায় নারী? 'নারী' কি এমনই একটি শব্দ, যাহা কেবল স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত? হিন্দু-মন সেই-সব আদর্শকে ভয় করে, যেগুলি অনুসারে দেহ দেহেই আসক্ত হইবে। না, না! নারী, দেহ-সংক্রান্ত কোন কিছুর সহিত তুমি যুক্ত হইবে না। তোমার নাম চিরকালের জন্য পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'মা'- নাম ছাড়া এমন কি শব্দ আছে, যাহাকে কোনপ্রকার কামভাব স্পর্শ করিতে পারে না, কোনপ্রকার পশুভাব যাহার নিকটে আসিতে পারে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ।

আমি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা অনেকটা আপনাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিক্ষুক সাধুদের মত। অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আমাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, জনসাধারণ যখন চায়, তখন ধর্মকথা শুনাইতে হয়। যেখানে আশ্রয় পাই, সেখানে ঘুমাই। আমাদিগকে এই ধরনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নারীকে এমন কি ক্ষুদ্র বালিকাকেও 'মা' সম্বোধন করিতে হয়। ইহাই আমাদের প্রথা। পাশ্চাত্যে আসিয়াও আমার পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। মহিলাদের 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে দেখিতাম, তাঁহারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। প্রথম প্রথম ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে কারণ আবিষ্কার করিলাম। বুঝিলাম 'মা' হইলে তাঁহারা যে 'বুড়ী' হইয়া যাইবেন। ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য

ক্ষমাশীলা জননী। জায়া জননীর পশ্চাতে থাকেন—ছায়ার মত। স্ত্রীকে মায়ের জীবন অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য। জননীই প্রেমের আদর্শ, তিনিই পরিবারকে শাসন করেন, সমগ্র পরিবারটির উপর তাঁহার অধিকার। ভারতে সন্তান যখন কোন অন্যায় কাজ করে, পিতা তখন তাহাকে প্রহার করেন এবং মাতা সর্বদা পিতা ও সন্তানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ান। আর এদেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এদেশে মায়ের কাজ ছেলেকে মারধোর করা, এবং বেচারী বাবাকে মধ্যস্থ হইতে হয়। লক্ষ্য করুন—আদর্শের পার্থক্য। বিরূপ সমালোচনা হিসাবে আমি ইহা বলিতেছি না। আপনারা যাহা করেন, তাহা ভালই; কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমাদের পথ। মাতা সন্তানকে অভিশাপ দিতেছেন—ইহা আপনারা কখনও শুনিতে পাইবেন না। মা সর্বদাই ক্ষমা করেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'র পরিবর্তে আমরা নিরন্তন বলি 'মা'। মাতৃ-ভাব এবং মাতৃ-শব্দ হিন্দু-মনে চিরদিন অনন্ত প্রেমের সহিত জড়িত। আমাদের এই মরজগতে মায়ের ভালবাসাই ঈশ্বর-প্রেমের নিকটতম। মহাসাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেনঃ করুণা কর, জননি, আমি দুষ্ট; কিন্তু 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

ঐ দেখ হিন্দু জননী। পুত্রবধূ আসে তাঁহার কন্যারূপে। বিবাহ হইলে কন্যা পরগৃহে চলিয়া যায়, বিবাহ করিয়া পুত্র আর একটি কন্যা ঘরে আনে এবং পুত্রবধূ কন্যার শূন্যস্থান পূরণ করে। পুত্রবধূকে সেই রাজ-রাজেশ্বরীর অর্থাৎ স্বামীর মাতার শাসন-ব্যবস্থার ভিতর মানাইয়া লইতে হইবে। আমি তো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী কখনও বিবাহ করে না। মনে করুন, আমি যদি বিবাহ করিতাম, এবং আমার স্ত্রী যদি আমার মায়ের অসন্তোষের কারণ হইত, তাহা হইলে আমিও আমার স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইতাম। কেন? আমি কি আমার মাকে পূজা করি না? সুতরাং মায়ের পুত্রবধূও কেন তাঁহাকে পূজা করিবে না? যাঁহাকে আমি পূজা করি, আমার স্ত্রী তাঁহাকে কেন পূজা করিবে না? কে সে, যে আমার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়া আমার মাকেও শাসন করিবে? তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, যতক্ষণ না তাহার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। এই মাতৃত্বই নারীত্বকে পূর্ণ করে; মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব। এই মাতৃত্ব পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার পরই সে সমান অধিকার লাভ করে। তাই হিন্দুর নিকট মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অহো! আদর্শের কি

বিস্ময়কর প্রভেদ দেখিতেছি! আমার জন্মের জন্য আমার পিতামাতা বৎসরের পর বৎসর কত পূজা ও উপবাস করিয়াছিলেন! প্রত্যেক সন্তানের জন্মের পূর্বে মাতাপিতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের মহান্ স্মৃতিকার মনু আর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'প্রার্থনার ফলে যাহার জন্ম, সে-ই আর্য।' প্রার্থনা ব্যতীত যে-শিশুর জন্ম হয়, মনুর মতে সে অবৈধ সন্তান। সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। অভিশাপ মস্তকে লইয়া যে-সব শিশু এই জগতে আসে, তাহারা যেন এক অসতর্ক মুহূর্তে আসিয়া পড়ে, কারণ তাহাদের আসা রোধ করিতে পারা যায় নাই—এইরূপ সন্তানদের নিকট কি আশা করিতে পারা যায়? মার্কিন জননীগণ, আপনারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনাদের অন্তরের অন্তস্তলে ভাবিয়া দেখুন, আপনারা কি প্রকৃত নারী হইতে প্রস্তুত? এখানে কোন জাতি বা দেশের প্রশ্ন নাই, স্বজাতি-গৌরব- বোধের মিথ্যা ভাবালুতা নাই। দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত জগতে আমাদের এই মরজীবনে গর্ববোধ করিতে কে সাহস করে? ঈশ্বরের এই অনন্ত শক্তির নিকট আমরা কতটুকু? তথাপি আপনাদের আজ আমি এই প্রশ্ন করিতে চাই, ভবিষ্যৎ সন্তানটির জন্য কি আপনারা সকলে প্রার্থনা করেন? মাতৃত্ব লাভ করিয়া কি আপনারা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ? মাতৃত্বের জন্য কি আপনারা নিজেদের শুদ্ধ পবিত্র মনে করেন? নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি আপনারা ঐরূপ না বোধ করেন, তবে আপনাদের বিবাহ মিথ্যা, মিথ্যা আপনাদের নারীত্ব; আপনাদের শিক্ষা কুসংস্কার মাত্র। আর প্রার্থনা ব্যতীত যদি আপনাদের সন্তান হইয়া থাকে, তবে তাহারা মানবজাতির অভিশাপ হইবে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ উপস্থিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করুন। মাতৃত্ব হইতে বিরাট দায়িত্ব আসে। মাতৃত্বই ভিত্তি—আরম্ভ। আচ্ছা, মাকে এইরূপ পূজা করিতে হইবে কেন? কারণ আমাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, সন্তান ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয়, গর্ভবাসকালীন প্রভাবের দ্বারা। লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ে যান, লক্ষ লক্ষ পুস্তক পড়ুন, পৃথিবীর সব পণ্ডিতের সঙ্গ করুন—এগুলির প্রভাব অপেক্ষা জন্মকালীন শুভসংস্কারের প্রভাব বেশী। শুভ বা অশুভ উদ্দেশ্য লইয়াই আপনার জন্ম। শিশু জন্মগ্রহণ করে—হয় দেবতারূপে, নয় দানবরূপে—শাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করে। শিক্ষা এবং আর সব কিছু পরে আসে, ঐগুলি অতি তুচ্ছ। যে-ভাব লইয়া আপনার জন্ম হইয়াছে, তাহাই আপনার ভাব। অস্বাস্থ্য লইয়া

যাহার জন্ম, পাইকারী হারে গোটাকয়েক ঔষধের দোকান খাইলেও সে কি সারাজীবন সুস্থ থাকিতে পারিবে? দুর্বল রুগ্ন পিতামাতা, যাহাদের রক্ত দূষিত, তাহাদের সন্তান কয় জন সুস্থ ও সবল? একজনও নয়! প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া হয় দেবতা, নয় দানবরূপে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। শিক্ষা বা আর সব কিছু অতি তুচ্ছ।

আমাদের শাস্ত্র এইরূপ বলেঃ গর্ভকালীন প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ কর। জননীকে কেন পূজা করিতে হয়? কারণ তিনি নিজেকে পবিত্র করিয়াছেন। পবিত্রতা স্বরূপিণী হইবার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, ভারতবর্ষে কোন নারী কোন পুরুষকে দেহ দান করার কথা ভাবিতেই পারেন না, দেহ তাঁহার নিজস্ব। যাহাকে দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলে, ইংরেজরা সমাজসংস্কার হিসাবে বর্তমান ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্তন করিয়াছে; কিন্তু কোন ভারতবাসীই ঐ আইনের সুযোগ গ্রহণ করিবে না। পুরুষ যখন নারীর দেহ-সম্পর্কে আসে, তখন নারী কত না প্রার্থনা ও ব্রতদ্বারা ঐ মিলন পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে! কারণ যে-পথে শিশুর আগমন, তাহা যে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রতম প্রতীক। ইহা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা প্রচণ্ড ভাল অথবা মন্দ শক্তির সম্ভাবনাযুক্ত আর একটি জীবকে এই জগতে লইয়া আসিতেছে। ইহা কি একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার? ইহা কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি? ইহা কি দেহের পাশবিক সুখসম্ভোগ? হিন্দু বলে, 'না, না, সহস্রবার না।'

কিন্তু এইটির অনুগামী আর একটি ভাব আছে। সর্বংসহা সর্বক্ষমাশীলা জননীর প্রতি ভালবাসার আর্দশ লইয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। জননীকে যে পূজা করা হয়, তাহার উৎস এইখানেই। আমাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য তিনি তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি পূজনীয়া। তারপর আমরা কোন্ ভাবটি পাই? মাতৃত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে জায়াভাব।

আপনারা—পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। আমি এই কাজটি করিতে চাই, যেহেতু আমি এটি পচ্ছন্দ করি। আমি সকলকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিব। কেন?

আমার খুশি। আমি নিজের পরিতৃপ্তি চাই, সেইজন্য আমি এই নারীটিকে বিবাহ করিব। কেন? আমি তাহাকে পছন্দ করি। এই নারী আমাকে বিবাহ করিয়াছে। কেন? সে আমাকে পছন্দ করে। এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে আর আমি—এই দুইজনেই আছি, আমি তাহাকে এবং সে আমাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, আর কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। আপনাদের শ্রীমান্ ও শ্রীমতীরা বনে গিয়া তাহাদের রুচিমত জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের যখন সমাজে বাস করিতে হয়, তখন তাহাদের বিবাহ আমাদের শুভাশুভের সহিত জড়িত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাহাদের সন্তানগণ অগ্নিসংযোগকারী, হত্যাকারী দস্যু, পরস্বাপহারী, মদ্যপ, জঘন্যাচারী ও ক্রূরকর্মা—সাক্ষাৎ দানব হইতে পারে।

এখন ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি কি? ইহা বর্ণভিত্তিক বিধান। আমার জন্ম—বর্ণ বা জাতির জন্য, তাহার জন্যই আমার জীবন। অবশ্য আমার নিজের কথা বলিতেছি না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ফলে আমরা জাতি-বর্ণের বহির্ভূত। যাহারা সমাজে বাস করে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। কোন এক বর্ণে জন্ম বলিয়া সেই বর্ণের ধর্মানুযায়ী আমাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতেই হইবে। অর্থাৎ আপনাদের দেশের আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্য মানব আজন্ম স্বাতন্ত্র্যবাদী, আর হিন্দু সমাজতান্ত্রিক, পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। সেইজন্য শাস্ত্র বলে যে, যদি পুরুষকে তাহার মনের মত যে-কোন নারী বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং নারীকেও তাহার মনের মত যে-কোন পুরুষকে বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন কি হয়? তুমি প্রেমে পড়। মেয়েটির পিতা হয়তো উন্মাদ বা যক্ষ্মারোগী। মেয়েটি হয়তো একটি পাঁড়-মাতাল ছেলের মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সমাজবিধি কি বলে? ধর্মের অনুশাসনে এই-সব বিবাহ অবৈধ। মদ্যপায়ী, ক্ষয়রোগী, উন্মাদ প্রভৃতির সন্তানদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইবে না। ধর্ম বলে, বিকলাঙ্গ কুব্জ বিকৃতবুদ্ধি জড়বৎ ব্যক্তিদের বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

কিন্তু মুসলমানরা আরব হইতে ভারতবর্ষে আসিল, তাহাদের আছে আরবী আইন, আর আরবের মরুভূমির আইন আমাদের উপর জোর করিয়া চাপানো হইল। ইংরেজরা আসিল

তাহাদের আইন লইয়া। যতদূর সাধ্য তাহাও আমাদের উপর চালু করিল। আমরা পরাজিত জাতি। ইংরেজ যদি বলে, 'কাল তোমার ভগিনীকে বিবাহ করিব', আমরা কি করিতে পারি?

আমাদের সমাজ-বিধানে বলে, পরস্পরের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের দূরত্ব যতই থাকুক না কেন, এক জ্ঞাতিগোত্রের ভিতর বিবাহ অবৈধ। কারণ ঐরূপ বিবাহের দ্বারা জাতির অধোগতি হয়, বংশ লোপ পায়। কিছুতেই এ ধরনের বিবাহ হইতে পারে না এবং এইখানেই এ প্রসঙ্গ থামিয়া যায়। সুতরাং আমার বিবাহ-ব্যাপারে আমার নিজের কোন মত নাই, আমার ভগিনীর বিবাহ-ব্যাপারে—তাহারও মতামত কিছু নাই। জাতি-বর্ণের অনুশাসনের দ্বারা সব কিছু নির্ধারিত হয়।

অনেক সময় আমাদের দেশে শৈশবেই বিবাহ দেওয়া হয়। কেন? সমাজের আদেশ। পুত্র-কন্যাদের সম্মতি ছাড়াই যদি তাহাদের বিবাহ দিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমের উন্মেষের পূর্বে শৈশবেই বিবাহ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা পৃথক্‌ভাবে বড় হয়, তাহা হইলে বালকের হয়তো অন্য আর একটি বালিকাকে ভাল লাগিতে পারে এবং বালিকাও হয়তো আর একটি বালককে পচ্ছন্দ করিতে পারে। ফলে একটা মন্দ কিছু ঘটিতে পারে। সেইজন্য সমাজ বলে যে, ঐখানেই উহা বন্ধ করিয়া দাও। আমার ভগিনী বিকলাঙ্গ সুশ্রী বা কুশ্রী, তাহা আমি গ্রাহ্যই করি না, সে আমার ভগিনী—ইহাই যথেষ্ট। সে আমার ভ্রাতা—এইটুকু জানিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে। আপনারা বলিতে পারেন, 'অনেকখানি আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত। পুরুষের পক্ষে একটি নারীর প্রেমে পড়ার এবং নারীর পক্ষে একজন পুরুষের প্রেমে পড়ার কি অপূর্ব হৃদয়াবেগ, সে আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ইহা তো ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসার মত। যেন ভালবাসিতে তাহারা বাধ্য।' ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু হিন্দু বলে, 'আমরা সমাজতান্ত্রিক। একটি পুরুষ বা নারীর তীব্র সুখের জন্য আমরা শত শত লোকের মস্তকে দুঃখের বোঝা চাপাইতে চাই না।'

তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত বধূ স্বামীর ঘরে আসে—ইহাকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় বিবাহ।' শৈশবকালীন বিবাহকে বলা হয় 'প্রথমে বিবাহ' এবং তাহারা পৃথকভাবে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে মেয়েদের সঙ্গে—পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। যখন তাহাদের বয়স হয়, তখন 'দ্বিতীয় বিবাহ' নামক আর একটি অনুষ্ঠান করা হয়। তারপর তাহারা একসঙ্গে বাস করিতে থাকে, কিন্তু পিতামাতার সহিত একত্র একই বাড়িতে। বধূ যখন জননী হয়, তখন তাহার পরিবারটুকুর সর্বেসর্বা হইবার সময় আসে।

এখন আর একটি অদ্ভুত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলিব। আমি এইমাত্র আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রথম দুই তিন বর্ণের ভিতর বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারে না; ইচ্ছা থাকিলেও পারে না। অবশ্য অনেকের নিকট ইহা একটি কঠোরতা। অস্বীকার করা যায় না যে, বহু বিধবাই ইহা পছন্দ করে না, কারণ বিবাহ না করার অর্থ হইল ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করা; অর্থাৎ তাহারা কখনই মাছ-মাংস খাইবে না, মদ্য পান করিবে না এবং শ্বেতবস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পারিবে না, ইত্যাদি। এ জীবনে বহু বিধি-নিষেধ আছে। আমরা সন্ন্যাসীর জাতি, সর্বদাই তপস্যা করিতেছি এবং তপস্যা আমরা ভালবাসি। মেয়েরা কখনও মাংস খায় না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের কষ্ট করিয়া পানাহারে সংযম অভ্যাস করিতে হইত, মেয়েদের পক্ষে ইহা কষ্টকর নয়। আমাদের মেয়েরা মনে করে, মাংস খাওয়ার কথা চিন্তা করিলেও মর্যাদাহানি হয়। কোন কোন বর্ণের পুরুষেরা মাংস খায়, কিন্তু মেয়েরা কখনও খায় না। তথাপি বিবাহ না করিতে পাওয়া যে অনেকের পক্ষে কষ্ট—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদিগকে আবার মূলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারতীয়েরা গভীরভাবে সমাজতান্ত্রিক। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশের উচ্চ বর্ণের ভিতর পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অনেক বেশী। ইহার কারণ কি? কারণ উচ্চবর্ণের নারীরা বংশানুক্রমে আরামে জীবনে যাপন করেন। 'তাঁহারা পরিশ্রম করেন না, সুতাও কাটেন না, তথাপি সলোমন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদেও তাঁহাদের মত ভূষিত হন নাই।'৫ আর বেচারী পুরুষেরা, তাহারা মাছির মত মরে। ভারতবর্ষে আরও বলা হয়, মেয়েদের প্রাণ

বড়ই কঠিন, সহজে যায় না। পরিসংখ্যানে দেখিবেন যে, মেয়েরা অতি দ্রুতহারে পুরুষের সংখ্যা অতিক্রম করে। অবশ্য বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই মত কঠোর পরিশ্রম করে বলিয়া ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চবর্ণের নারী-সংখ্যা নিম্নবর্ণের অপেক্ষা অধিক। তাই নিম্নবর্ণের অবস্থা ঠিক বিপরীত। নিম্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সকলে কঠিন পরিশ্রম করে। স্ত্রীলোকদের আবার একটু বেশী খাটিতে হয়, কারণ তাহাদের ঘরের কাজও করিতে হয়। এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তাই আসিত না, কিন্তু আপনাদেরই একজন মার্কিন পর্যটক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

'হিন্দু-আচার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাহাই বলুক না কেন, আমি ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নাই যে, লাঙ্গল টানিবার বলদের সঙ্গে বা গাড়ি টানিবার কুকুরের সঙ্গে স্ত্রীলোক জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইওরোপের কোন কোন দেশে যেমন করা হয়। ভারতবর্ষে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে জমি চাষ করিতে দেখি নাই। রেলগাড়ি ধরিয়া দুই পাশে দেখিয়াছি যে, রোদেপোড়া পুরুষ ও বালকেরা খালি গায়ে জমি চষিতেছে; কিন্তু একটি স্ত্রীলোকও চোখে পড়ে নাই। দুই ঘণ্টা রেল ভ্রমণের মধ্যে মাঠে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে কাজ করিতে দেখি নাই। ভারতবর্ষে নিম্নতম বর্ণের মেয়েরাও কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করে না। অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ের মেয়েদের তুলনায় তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত আরামের; হলকর্ষণ তাহারা কখনই করে না।'

এইবার দেখ। নিম্নবর্ণের পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিক। এখন কি আশা কর? পুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়া নারী বিবাহ করিবার অধিকতর সুযোগ পায়।

বিধবাদের বিবাহ না হওয়া প্রসঙ্গেঃ প্রথম দুই বর্ণের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিমাত্রায় অধিক; এইজন্যই এই উভয় সঙ্কট—একদিকে বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়া জনিত সমস্যা ও দুঃখ, অন্যদিকে বিবাহযোগ্যা কুমারীদের স্বামী না পাওয়ার সমস্যা। কোন্ সমস্যাটির আমরা সম্মুখীন হইব—বিধবা-সমস্যা অথবা বয়স্কাকুমারী-সমস্যা? এই দুইটির মধ্যে একটি লইতেই হইবে। এখন আসুন, 'ভারতীয় মন সমাজতান্ত্রিক'—সেই মূল ভাবটিতে ফিরিয়া যাই। সমাজতান্ত্রিক ভারতবাসী বলে, 'দেখ, আমরা বিধবা-

সমস্যাটিকে ছোট মনে করি। কেন? কারণ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছিল, তাহারা বিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা সুযোগ হারাইয়াছে, তথাপি একবার তো তাহাদের ভাগ্যে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এখন শান্ত হও এবং সেই ভাগ্যহীনা কুমারীদের কথা চিন্তা কর—যাহারা বিবাহ করিবার সুযোগ একবারও পায় নাই।' ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন বেলা দশটা হইবে, শত সহস্র মহিলা বাজার করিতেছেন। এই সময়ে একজন ভদ্রলোক, বোধ হয় তিনি মার্কিন, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হায় ভগবান্! ইহাদের মধ্যে কয়জন স্বামী পাইবে!' সেইজন্য ভারতীয় মন বিধবাদিগকে বলে, 'ভাল কথা, তোমাদের তো সুযোগ মিলিয়াছিল, তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যই আমরা খুবই দুঃখিত; কিন্তু আমরা নিরুপায়। আরও অনেকে যে (বিবাহের জন্য) অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।' অতঃপর এই সমস্যার সমাধানে ধর্মের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; হিন্দুধর্ম একটি সান্ত্বনার ভাব লইয়াই আসে। কারণ আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়, বিবাহ একটা মন্দ কাজ, ইহা শুধু দুর্বলের জন্য। আধ্যাত্মিক সংস্কারসম্পন্ন নারী বা পুরুষ আদৌ বিবাহ করেন না। সুতরাং ধর্মপরায়ণা নারী বলেন, 'ঈশ্বর আমাকে ভাল সুযোগই দিয়াছেন, সুতরাং আমার আর বিবাহের প্রয়োজন কি? ভগবানের নাম করিব, তাঁহার পূজা করিব।' মানুষকে ভালবাসিয়া কি লাভ? অবশ্য ইহা সত্য যে, সকলেই ভগবানে মন দিতে পারে না। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাদের জন্য অপর বেচারীরা কষ্ট পাইতে পারে না। আমি সমস্যাটিকে আপনাদের বিচারের উপর ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আপনারা জানিয়া রাখুন, ইহাই হইল ভারতীয় মনের চিন্তাধারা।

অতঃপর নারীর দুহিতারূপে আসা যাক। ভারতীয় পরিবারে কন্যা একটি অতি কঠিন সমস্যা। কন্যা এবং বর্ণ-জাতি—এই দুইটি মিলিয়া হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে, কারণ কন্যার বিবাহ একই বর্ণের ভিতর দিতেই হবে, এবং বর্ণের ভিতরও আবার ঠিক একই প্রকার বংশমর্যাদার পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। সেইজন্য বেচারী পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য অনেক সময় ভিখারী হইয়া যাইতে হয়। পাত্রের পিতা পুত্রের জন্য বিরাট

পণ দাবী করেন, এবং কন্যার পিতাকে কন্যার বর সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়। সেইজন্য হিন্দুর জীবনে কন্যা যেন একটি কঠিন সমস্যা। মজার কথা ইংরেজীতে কন্যাকে বলা হয় 'ডটর', সংস্কৃতে উহার প্রতিশব্দ 'দুহিতা'। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, প্রাচীনকালের পরিবারে কন্যারা গো দোহন করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং 'দুহিতা' শব্দটি দোহন করা অর্থে 'দুহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'দুহিতা'র প্রকৃত অর্থ হইতেছে দোহনকারিণী। পরে 'দুহিতা' শব্দটির একটি নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দোহনকারিণী—দুহিতা পরিবারের সমস্ত 'দুগ্ধ' দোহন করিয়া লইয়া যায়, ইহাই হইল দ্বিতীয় অর্থ।

ভারতীয় নারী যে-সকল বিভিন্ন সম্পর্কে সম্বন্ধ, সেগুলি বর্ণনা করিলাম। আমি আপনাদের পূর্বে বলিয়াছি যে, হিন্দুসমাজে জননীর স্থান সকলের উপরে, তাঁহার পর জায়া এবং তারপর কন্যা। এই পর্যায়ের ক্রম অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। বহু বৎসর সে-দেশে বাস করিয়াও কোন বিদেশী ইহা বুঝিতে পারেন না। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের ভাষার ব্যক্তিবাচক 'সর্বানাম'-এর তিনটি রূপ আছে। ইহারা অনেকটা 'ক্রিয়া'র মত কাজ করে। একটি খুবই সম্মানসূচক, দ্বিতীয়টি মধ্যম এবং সর্বনিম্নটি অনেকটা ইংরেজীর দাউ (thou) ও দী (thee)-এর মত। শিশু এবং ভৃত্যদের সম্পর্কে শেষেরটি প্রয়োগ করা হয়। মধ্যমটি সমান সমান লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখিতেছেন যে, আত্মীয়তার সর্বপ্রকার জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সর্বনামগুলি ব্যবহার করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আজীবন আমি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু তিনি কখনও আমাকে 'আপনি' বলিবেন না, তিনি আমাকে 'তুমি' বলিবেন, ভুলক্রমেও তিনি আমাকে 'আপনি' বলিবেন না; যদি বলেন, তাহাতে অমঙ্গল বুঝিতে হইবে।

গুরুজনদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইলে সেইরূপ, সর্বদা ঐ প্রকার ভাষাতেই করিতে হইবে। পিতামাতাকে তো দূরের কথা, বড় ভাই বা বোনকেও 'তু', 'তুম্' বা 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে আমার সাহসই হইবে না। আর মাতাপিতার নাম ধরিয়া আমরা কখনই ডাকি না। যখন আপনাদের দেশের প্রথা জানিতাম না, তখন একটি খুবই

মার্জিত-রুচি পরিবারে পুত্রকে জননীর নাম ধরিয়া ডাকিতে দেখিয়া আমি গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বুঝিলাম, ইহাই এই দেশের রীতি। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কখনই পিতামাতার উপস্থিতিতে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করি না। এমন কি তাঁহাদের সামনেও 'প্রথম পুরুষের বহুবচন'-এ উল্লেখ করি। এইরূপে আমরা দেখি যে, ভারতীয় নারী-পুরুষের সমাজ-জীবনে এবং সম্পর্কের তারতম্যে জটিলতম জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে গুরুজনদের সম্মুখে কেহ স্ত্রীর সহিত কথা বলে না। একাকী যখন অপর কেহ থাকে না বা শুধু ছোটরা থাকে, তখনই স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা বলা যায়। যদি আমি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামনে স্ত্রীর সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু বড় বোন বা পিতামাতার সম্মুখে বলিতাম না। ভগিনীদের নিকট তাহাদের স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিতে পারি না। ভাবটি এই যে, আমরা সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক জাতি। এই একটি ভাবের উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিবাহকে একটা অপবিত্র, একটা নিম্ন পর্যায়ের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য প্রেমের বিষয় লইয়া কোন আলোচনা কখনও করা চলিবে না। মা, ভাই, বোন বা অপর কাহারও সামনে আমি কোন উপন্যাস পড়িতে পারি না। তাঁহারা আসিলে উপন্যাসটি বন্ধ করিয়া দিই।

পান-ভোজনের ব্যাপারেও এই একই রীতি। আমরা গুরুজনদের সম্মুখে আহার করি না। শিশু বা সম্পর্কে ছোট না হইলে কোন পুরুষের সম্মুখে আমাদের মেয়েরা কখনও আহার করে না। মেয়েরা বলে, 'মরিয়া যাইব, তবু স্বামীর সম্মুখে কিছু চিবাইতে পারিব না।' মাঝে মাঝে ভাই ও বোনেরা একত্র খাইতে বসিতে পারে। ধরুন আমি এবং আমার ভগিনী একসঙ্গে খাইতেছি, এমন সময় ভগিনীর স্বামী দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল– তখনই ভগিনী খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে, আর স্বামী-বেচারা সরিয়া পড়িবে।

যে-সব প্রথা আমাদের দেশের একান্ত নিজস্ব, সেইগুলি আমি বলিলাম। ইহাদের ভিতর কতকগুলি আমি অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করিয়াছি। আমি কখনও বিবাহ করি নাই। বধূসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ নয়। মাতা এবং ভগিনী যে কি, তাহা আমি জানি; অপরের

বধূ আমি দেখিয়াছি মাত্র, তাহা হইতে যেটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনাদের বলিলাম।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি নির্ভর করে পুরুষের উপর; অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন, সেখানে মেয়েরাও ঐরূপ হইবে। যেখানে পুরুষদের সংস্কৃতি নাই, সেখানে মেয়েদেরও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুপ্রথা-অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামীণ ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের ভাষায় এগুলি ছিল সরকারের। জমির উপর কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার নাই। ভারতবর্ষে রাজস্ব জমি হইতে আসে, কারণ প্রত্যেকে সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করে। এই জমি একটি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি, এবং পাঁচ দশ কুড়ি বা একশ-টি পরিবার একত্র ঐ জমি দখলে রাখিতে পারে। সমস্ত জমি তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তাহারা সরকারকে দেয় এবং একটি চিকিৎসক এবং শিক্ষকের ভরণপোষণ করে, ইত্যাদি।

আপনাদের ভিতর যাঁহারা হারবার্ট স্পেন্সার পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে আছে, তিনি তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে ‘মঠপদ্ধতি’ বলিয়াছেন। ইহা ইওরোপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহার ভার ঐ গ্রামকে লইতে হইবে। আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অতি সাধারণ। কারণ আমাদের পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল। প্রত্যেক বালক একটি ছোট মাদুরের আসন লইয়া আসে। তালপাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকটি বালক তাহার আসন বিছাইয়া বসে, দোয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য পাটীগণিত, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা ও হিসাব—এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতিবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ করাইয়াছিলেন, উহার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছেঃ ‘গ্রামের হিতের জন্য পরিবার, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের হিতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ

করিবে।'৬ এইরূপ অনেক শ্লোক ঐ পুস্তকে আছে। আমরা ঐগুলি মুখস্থ করি, এবং শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া দেন, পরে ছাত্রও ব্যাখ্যা করে। বালক-বালিকারা একত্র এগুলি শিক্ষা করে। ক্রমে তাহাদের শিক্ষা পৃথক্ হইয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্যই ছিল। ছাত্রীরা কদাচিৎ সেখানে যাইত; কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল।

বর্তমানকালে ইওরোপীয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক—এই দিকেই জনমত প্রবল হইতেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা চায় না; কিন্তু যাহারা চায়, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমেরিকায় হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ বৎসরেরও অধিক হইল, নারীদের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমার মনে আছে, যে বৎসর আমি বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকটি ছাত্রীও ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, একই পাঠ্যসূচী ছিল এবং পরীক্ষায় ছাত্রীরা বেশ ভালই করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। এইরূপে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি—ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তী কালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে। বৈদেশিক শাসনে কি আর আশা করা যায়? বিদেশী বিজেতারা আমাদের কল্যাণ করিবার জন্য তো আসে নাই। তাহারা ধন-সম্পদ্ চায়। আমি বারো বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করিয়াছি; কিন্তু আমার দেশে আমি মাসে পাঁচ ডলারও উপার্জন করিতে পারি না। ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করিবেন? ইহাই প্রকৃত অবস্থা। বিদেশী-প্রবর্তিত শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য—বহুসংখ্যক কেরানী, পোস্টমাস্টার, টেলিগ্রাফ অপারেটর প্রভৃতি তৈরি করিয়া অল্প অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনের উপযোগী একদল কর্মদক্ষ ক্রীতদাস পাওয়া। ইহাই হইল এই শিক্ষার স্বরূপ।

ফলে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশে করিবার অনেক কিছু আছে। যদি আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন এবং অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই একটি প্রবাদ বাক্য আমি বলি, 'হংসীর যাহা খাদ্য, হংসেরও খাদ্য তাই।'৭

বিদেশী মহিলারা হিন্দু মেয়েদের কঠোর জীবন দেখিয়া কত চীৎকার করেন—কাঁদেন, কিন্তু হিন্দু পুরুষদের কঠোর জীবনের উপর আপনাদের কোনই দৃষ্টি নাই। আপনাদের চোখের জল কৃত্রিম। ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহ হয় কাহাদের সহিত? একজনের যখন বলা হইল যে, বৃদ্ধদের সহিত এই বালিকাদের বিবাহ হয়, তখন সে বলিয়া উঠিল, 'যুবকেরা তাহা হইলে কি করে? কি আশ্চর্য! বালিকাদের কি বৃদ্ধদের সহিত—কেবল বৃদ্ধদের সহিতই বিবাহ দেওয়া হয়?' আমরা যে বৃদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করি—বোধ হয় আমাদের দেশের সব লোকই ঐরূপ।

আত্মার মুক্তি ভারতবর্ষের আদর্শ। জগৎটা কিছুই নয়। উহা একটা দৃশ্য মাত্র, একটা স্বপ্ন। এই জীবন কোটি কোটি জীবনের মত একটি। সমস্ত প্রকৃতিই মায়া, একটা ছায়া, ছায়ার আগার। ইহাই হইল ভারতীয় জীবন-দর্শন। শিশুরা জীবনকে অভিনন্দিত করে, ইহাকে মধুর ও সুন্দর বলিয়া মনে করে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই যেখান হইতে তাহারা শুরু করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেখানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন শেষ হইবে। যৌবন-মত্ত জাতিরাও ভাবে যে, তাহারা যাহা খুশি তাহাই করিতে পারে। তাহারা মনে করে, আমরাই পৃথিবীর অধিপতি—দেবতা, ভগবানের চিহ্নিত জাতি। তাহারা ভাবে—সমগ্র জগৎকে শাসন করিবার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার, তাহাদের যাহা ইচ্ছা করিবার, পৃথিবীকে ওলট-পালট করিবার আদেশপত্র সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে দিয়াছেন; হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার ছাড়পত্র তাহারা পাইয়াছে। ভগবান্ তাহাদিগকে এই-সব স্বাধীনতা দিয়াছেন, শিশু বলিয়াই তাহারা এই-সব অপকর্ম করে। তাই সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের কত মহিমা ও বর্ণচ্ছটা! কিন্তু তাহারা বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হয়তো ধ্বংসস্তূপেই সেগুলি বিরাট!

পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা যেমন টলমল করিয়া মুহূর্তে পড়িয়া যায়, তেমনি এই নশ্বর জীবন। যেদিকেই আমরা তাকাই, সেদিকেই দেখি ধ্বংস। আজ যেখানে অরণ্য, এক সময়ে সেখানেই ছিল বড় বড় নগরীমণ্ডিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ভারতীয় মানুষের ইহাই হইল প্রধানতম চিন্তা ও মূল সুর। আমরা জানি, আপনাদের পাশ্চাত্য জাতির শিরায় তরুণ রক্ত প্রবাহিত। আমরা জানি, মানুষের মত জাতিরও সুদিন আসে। কোথায় গ্রীস? কোথায় রোম? সেদিনের সেই শক্তিধর স্পেন কোথায়? কে জানে এই-সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারতের কি হইতেছে? এইরূপেই জাতির জন্ম হয় এবং কালে তাহাদের ধ্বংস হয়; এইভাবেই তাহাদের উত্থান ও পতন। যাহাদের দুর্ধর্ষ সৈন্য-বাহিনীকে জগতের কোন শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, যাহারা তোমাদের সেই ভয়াবহ 'টার্টার' শব্দটি রাখিয়া গিয়াছে, সেই মুঘল আক্রমণকারীকে হিন্দু শৈশব হইতেই জানে। হিন্দু তাহার পাঠ শিক্ষা করিয়াছে। আজিকার শিশুদের মত সে প্রলাপ বকিতে চায় না। হে পশ্চাত্য জাতি! তোমাদের যাহা বলিবার তাহা বল। এখন তো তোমাদেরই দিন। বর্তমান কাল শিশুদের প্রলাপ বকিবার কাল। আমরা যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়াছি। এখন আমরা মৌন। তোমাদের কিছু ধনসম্পদ্ হইয়াছে, তাই তোমরা আমাদিগকে অবজ্ঞা কর। ভাল, এখন তোমাদেরই দিন। বেশ বেশ, শিশু তোমরা, আধ-আধ কথা বল—ইহাই হইল হিন্দুর মনোভাব।

অসার ফেনায়িত বাক্যের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। এমন কি মেধাশক্তির সহায়েও তিনি লভ্য নন। বাহুবলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর তাঁহারই কাছে আসেন, যিনি বস্তুর গোপন উৎসটি জানেন, যিনি অপর সব কিছুই নশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন; আর কাহারও নিকট তিনি আসেন না। যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ শিক্ষা পাইয়াছে। ভারত এখন ভগবানের অভিমুখী। ভারতবর্ষ অনেক ভুল করিয়াছে। তাহার উপর অনেক জঞ্জালের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়াছে। তাহাতে কি হইয়াছে? আবর্জনা-পরিষ্কারে, নগর-পরিষ্কারে কি হয়? উহা কি জীবন দেয়? যাহাদের সুন্দর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদেরও মৃত্যু হয়। আর প্রতিষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। ক্ষণভঙ্গুর এই পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলি—পাঁচদিন লাগে তাহাদের গড়িতে, আর ষষ্ঠ দিবসে সেগুলি ধ্বংস হইয়া

যায়। এই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি একটিও একাদিক্রমে দুই শত বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারে না। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। হিন্দু বলে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাচীন জাতিগুলির ধ্বংসের সাক্ষী, নূতন জাতিগুলিরও মৃত্যু দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। কারণ আমাদের আদর্শ ইহসংসারের নয়, ঊর্ধ্বলোকের। তোমার যেরূপ আদর্শ, তুমি সেইরূপই হইবে; আদর্শ যদি নশ্বর হয়, পৃথিবী-কেন্দ্রিক হয়, জীবনও সেইরূপ হইবে। আদর্শ যদি জড় হয়, তবে তোমরাও জড় হইবে। দেখ! আমাদের আদর্শ—আত্মা, আত্মাই একমাত্র সৎ-পদার্থ। আত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নাই এবং আমরা আত্মারই মত চিরজীবী।